বিশ্বসেরা সাত হররস্রষ্টার

হরর সেভেন

অনীশ দাস অপু



বিশ্বসেরা সাত লেখকের সাতটি হরর কাহিনী

হ র র সে ভে ন

সামান্থা লি

রবার্ট ব্লচ

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

কার্ল জ্যাকবি

জে. বি. স্টাম্পার

এলগারনন ব্ল্যাকউড

পিটার টিউনিস উড

অ নু বা দ

অনীশ দাস অপু



জাগৃতি প্রকাশনী



অনীশ দাস অপু // হরর সেভেন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক : ফয়সল আরেফিন দীপন
জাগৃতি প্রকাশনী
৩৩ আজিজ সুপার মার্কেট
নিচতলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৩২৩০

কার্যালয় : ৪২/এ আজিজ সুপার মার্কেট
২য় তলা, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০
আলাপন : ৮৬২৪২১৮

প্রচ্ছদ : ফয়সল আরেফিন

মুদ্রণ : দি ঢাকা প্রিন্টার্স
পান্থপথ, গ্রীনরোড, ঢাকা

মূল্য : দুইশত পঁচিশ টাকা

ISBN : 978 984 90202 8 8

জাগৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ফয়সল আরেফিন দীপন-এর সঙ্গে অনেকদিন পরে টেলিফোনে কথা হলো। দীপনের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৯৭ সাল থেকে। তাঁর প্রকাশনীতে এর আগে আমি গোটা দশেক বই লিখেছি। তিনি আমাকে এবং আমার লেখা যথেষ্টই পছন্দ করেন। তবে মাঝখানে ব্যক্তিগত কিছু কারণে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগটা প্রায় বিচ্ছিন্নই হয়ে গিয়েছিল। তবে এটা ঠিক মাঝেমাঝেই আমি জাগৃতিতে লেখার জন্য একটা তাগিদ অনুভব করছিলাম। সেদিন তিনি যখন এবারের বইমেলায় জাগৃতি-র জন্য লিখতে বললেন, আমি আর না করতে পারিনি। কারণ তাঁর প্রতি আমার একটা ভালোবাসার টান সবসময়ই ছিল!

হরর সেভেন সম্পর্কে প্রচ্ছদেই বলা হয়েছে এতে রয়েছে বিশ্বসেরা সাত হরর লেখকের সাতটি সেরা হরর কাহিনী। তবে প্রথম কাহিনীটি গল্প নয়, একটি পূর্ণাঙ্গ পিশাচ উপন্যাস। ছেলেবুড়ো সবারই ভালো লাগবে গা ছমছমে উপন্যাসটি। তবে এ বইয়ে আমার সবচেয়ে পছন্দের লেখক হলেন কার্ল জ্যাকবি এবং রবার্ট ব্লচ। এই অসাধারণ দুই হরর লেখকের দারুণ দু'টি হরর গল্প দিয়েছি আমি এ বইতে। পড়লে পাঠক সত্যি ভয় পাবেন। কিশোরদের জন্য হরর গল্প লিখে পৃথিবী মাতিয়েছেন জে.বি. স্টাম্পার। এই লেখকের গা হিম করা গল্প *দ্য হেডলেস ক্রিয়েচার* দেয়া হলো এ সংকলনে। তাদের ভালো লাগবে লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের *নাইট অব নাইটমেয়ারস* গল্পটিও। শরীরে শিহরণ জাগাবে এলগারনন ব্ল্যাকউডের *কীপ ইন হিজ প্রমিস* এবং পিটার টিউনিস উডের *দ্য টপ কোট* গল্প দু'টিও।

জাগৃতি থেকে এবছর আমার আরও যেসব হরর বই বেরুচ্ছে সেগুলো গল্প নয়, উপন্যাস। সেসব হরর উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে *দ্য থিং ইন দ্য ক্লজিট, দ্য হাউলিং গোস্ট, দ্য ক্রিপি ক্রিয়েচার, ফরেস্ট অব ফিয়ার, টাইম ফর টেরর* ইত্যাদি। আশা করি, যারা *হরর সেভেন* পছন্দ করবে তাদের এ হরর উপন্যাসগুলোও খুব ভালো লাগবে।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি, ফয়সল আরেফিন দীপন কিন্তু আমাকে আগামী বইমেলা অর্থাৎ ২০১৪ সালের জন্য এখনই বুকড করে রেখেছেন এবং বলেছেন ২০১৪ সালের বইমেলায় আমি যেন তাঁকে কমপক্ষে এক ডজন হরর উপন্যাস লিখে দেই। হয়তো তাঁর অনুরোধ শেষ পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করতেই হবে; কারণ ভালোবাসার মানুষদের একান্ত অনুরোধ আমি খুব কমই অগ্রাহ্য করতে পারি!

অনীশ দাস অপু
ধানমন্ডি, ঢাকা

সূ চি প ত্র

রিভেঞ্জ অব দ্য ইভিল ডটার
সামান্থা লি

গল্প শুরুর আগে...

এ গল্প এমি আর অ্যানির।

তবে এমির কথা এখন নয়, পরে। আগে আমরা অ্যানির কথা শুনব।

অ্যানির বয়স পনেরো বছর। সে দেখতে তেমন সুন্দরী নয়। তবে তার চোখ দুটি ভারী সুন্দর। কিন্তু সুন্দর আঁখিজোড়ায় কেমন একটা দুঃখী দুঃখী ভাব।

ছোটবেলাটা তার আর দশটা সাধারণ শিশুর মত হেসে খেলে কাটলেও বড় হবার পরে অ্যানির জীবনটা কেমন ওলোট পালট হয়ে গেছে। আর অ্যানির ওলোট পালট জীবনের জন্য দায়ী ওর মা– মেরী বেথ।

অ্যানির বাবা নেই। ওর ছোটবেলায় মা'র সঙ্গে বাবার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মা তারপর আরেকজনকে বিয়ে করেছে। কিন্তু এই লোকটাকে অ্যানি মোটেই পছন্দ করে না। তার সৎবাবাও অ্যানিকে পছন্দ করে না। অ্যানিকে তার মা'র কাছ ঘেঁষতেই দেয় না বলা চলে। সৎবাবা এমনই পাজি, অ্যানিকে দূরের এক বোর্ডিংস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছে যাতে মার সঙ্গে সে থাকতে না পারে। আর ওর মা-ও কী অদ্ভুত! স্বামীর এ ষড়যন্ত্র নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছে।

অ্যানির ওর বাবার কথা খুব মনে পড়ে। মনে পড়ে বাবার সঙ্গে মা প্রায়ই ঝগড়া করত। এক সময়ে দু'জনের বাতচিৎ বন্ধ হয়ে যায়, সবশেষে অমোঘ পরিণতি– ডিভোর্স। বাবা কিছুমাত্র বাক্য বিনিময় না করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

অ্যানিকে নিজের কাছে রাখার অনেক চেষ্টা করেছিল বাবা, মামলাও করেছিল। কিন্তু মামলায় হেরে গিয়েছিল। অ্যানি তখন খুব ছোট ছিল বলে অ্যানিকে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তার মা-ই পেয়েছিল।

সৎবাবাকে বিয়ে করার পর থেকে অ্যানির মা মেয়ের কাছ থেকে যেন ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছিল। মেয়েকে সে একদমই সময় দিত না। যে কোন ব্যাপারে স্বামীর পক্ষ নিত। ঝগড়াঝাঁটি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়– সৎবাবা অ্যানিকে আমেরিকার আরেক প্রান্তের একটি বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেয়।

সৎবাবাকে রীতিমত ঘৃণা করে অ্যানি। এবারের হ্যালোউইন ডে'র ছুটি মার সঙ্গে কাটানোর খুব শখ ছিল তার। কিন্তু ছুটির আগে আগে মাকে নিয়ে সৎবাপ ব্যবসার কাজের অজুহাত তুলে উড়াল দিয়েছে সুইটজারল্যান্ডে। ফলে অ্যানিকে ছুটি কাটাতে যেতে হচ্ছে তার গ্র্যানি বা নানুর বাড়ি।

বাবা-মার ডিভোর্সের পরে কিছুদিন স্টিলওয়াটার শহরে, নানা-নানুর বাড়িতে থেকেছে অ্যানি। নানা ওকে খুব আদর করতেন, নানুও। তবে নানা এখন নেই। মারা গেছেন। আর নানুর সঙ্গে অ্যানির দেখা হয় না আট-নয় বছর। নানুর কি ওর কথা মনে আছে? ট্রেনে চড়ার পর থেকে এ কথাটাই বারবার মনে হচ্ছিল অ্যানির। নয় বছর লম্বা সময়। নয় বছর আগে অ্যানির বয়স ছিল ছয়।

স্টিলওয়াটার স্টেশনে যখন ট্রেন থামল, ততক্ষণে ঘনিয়ে এসেছে সাঁঝের আঁধার। বেশ শীত পড়েছে। ট্রেন থেকে নামতেই হিমেল হাওয়ার ঝাপটায় অ্যানির শরীরের হাড়গুলো কনকন করে উঠল। ও হতাশা এবং রাগ নিয়ে লক্ষ্য করল প্ল্যাটফর্মে ওকে নিতে কেউ আসেনি। অথচ নানু জানেন ও আজ আসবে। নানু কি ভুলে গেছেন অ্যানির কথা?

একটু পরে ট্রেনটা চলে গেল অ্যানিকে স্টেশনে একা ফেলে রেখে। এখন চারপাশে গা ছমছমে নীরবতা। এই নৈশব্দ অ্যানিকে মনে করিয়ে দিল সেইসব নিরানন্দ দিনগুলোর কথা যখন ওর মা ওকে হতচ্ছাড়া চেহারার হোটেলে একা ফেলে রেখে সৎবাপের সঙ্গে শপিং-এ যেত।

ঠাণ্ডায় নিঃশ্বাস যেন জমে যাচ্ছিল অ্যানির। দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছিল। এদিকে রাত বাড়ছে। ভয় লাগছে অ্যানির। মনে হচ্ছে কেউ যেন ওকে দেখছে দূর থেকে শ্যেন দৃষ্টিতে। ও সভয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। কাউকে দেখতে পেল না।

তবে অ্যানি একা নয়। ছায়াঘেরা অন্ধকার কিনারে, স্টেশন হাউজের পেছনে ছোট-খাট গড়নের একটি ছায়ামূর্তি ওর দিকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে ছিল। তবে সে একটু পরেই ওখান থেকে সরে গেল একটা গাড়ি আসতে দেখে। গাড়িটাকে অ্যানিও দেখেছে। হেডলাইটের হলুদ আলোয় অন্ধকার চিরে এগিয়ে আসছে ওটা।

গাড়িটা কি অ্যানিকে নিতে আসছে?

জানে না অ্যানি।

তবে সে আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগল...।

এক

গা কাঁপিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটি, মধ্য পঞ্চাশের এক ভদ্রমহিলা সামনের জানালার কাঁচ নামিয়ে উঁকি দিলেন। তাঁর চোখে ফ্রেমলেস গ্লাস, পরনে নীল উলের কোট আর উজ্জ্বল চেককাটা স্কার্ফ। তালুর দিকে পাক ধরা, কালো চুলের বিনুনীটাকে সুরক্ষিত

করে রাখা পিনগুলোর বেশ কয়েকটার প্রায় খুলে যাবার মত অবস্থা।

দরজার হাতল খোলার চেষ্টা করছেন তিনি, চালকের দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে এল রোগা, লম্বা, ধূসর চুলের এক লোক। তার কাঁধজোড়া নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে, চেহারায় জীবন-যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার ছাপ। সে দ্রুত চলে এল মহিলার পাশে, তাঁকে দরজা খুলে নামতে সাহায্য করবে। কিন্তু ভদ্রমহিলা হাতের ইশারায় তাকে সরে যেতে বলে নেমে পড়লেণ টারমাকে। যেন গাড়ি থেকে গড়িয়ে নামল এক জলহস্তি।

ভদ্রমহিলাকে দেখে স্তম্ভিত অ্যানি। গ্র্যান্ডমা'র শুধু বয়সই বাড়েনি, ওজনও তিনি বাড়িয়েছেন কমপক্ষে চল্লিশ পাউন্ড।

'ওই গর্দভ কেরানিটা,' ঘোঁতঘোঁত করলেন তিনি; 'আমাকে ফোনে বলল ট্রেন সাড়ে ছ'টার আগে আসবে না। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছ, মা?'

ভল্লুকের মত জড়িয়ে ধরলেন তিনি নাতনীকে জবাবের অপেক্ষা না করে। তাঁর গায়ে লিলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ। পারফিউম মেখেছেন নানু। সঙ্গে সঙ্গে যেন তিন বছর বয়সে ফিরে গেল অ্যানি। সে দিন ক্রিসমাসের দিন, অ্যানির বাবা-মার তখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি আর সে ছিল ওর গ্র্যানির চোখের মণি। ওকে আলিঙ্গনমুক্ত করলেন নানী, সে সঙ্গে স্মৃতিগুলো মুছে গেল।

'উনি কে?' ধূসর চুলোকে চোখের ইশারায় দেখাল অ্যানি। লোকটা তার মালপত্র গাড়ির ট্রাংকে তুলছে।

'ও নাথান। কেন, নাথানকে মনে নেই? বাগানে কাজ করত। তোমার গ্র্যান্ডপা'র বন্ধু।'

অ্যানির চেহারা দেখে মনে হল না নাথানকে সে চিনতে পেরেছ।

'হ্যালো, অ্যানি,' নাথান এসে মোজাপরা একটি হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে নামিয়ে নিল হাতখানা। 'আমার কথা দেখছি ওর একদমই মনে নেই।'

'তাতে কিছু আসে যায় না,' বললেন নানী। 'শীঘ্রি তোমাদের দুজনের মধ্যে খাতির হয়ে যাবে। নাথান বাড়িতেই থাকে।'

'তোমার গ্র্যান্ডপাকে কথা দিয়েছিলাম তোমার ওপর খেয়াল রাখবো,' বলল নাথান। 'আর কথা দিলে তা রাখার চেষ্টা করি।'

'ও না থাকলে বড্ড অসুবিধে হয়ে যেত আমার,' বললেন নানী। 'ও আমাকে সবখানে গাড়ি করে নিয়ে যায়। আমি তো আর গাড়ি চালাতে পারি না। আর এই বুড়ো বয়সে শেখার আগ্রহও নেই। বাদ দাও এসব কথা... এবার দেখি তো তোমাকে!'

চরম বিরক্ত কিশোরী মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি, আঠালো চুলে হাত বোলালেন। তাঁর খুব মায়া লাগছিল নাতনীর জন্য। কতদিন মেয়েটাকে দেখেন না। কথাটা মুখে প্রকাশ করেও ফেললেন, 'কত বড় হয়ে গেছ তুমি! মনে হচ্ছে হাজার বছর পরে দেখলাম।'

'আমরা কি এখন যেতে পারি?' তীক্ষ্ণ গলায় বলল অ্যানি। 'শীতে জমে যাচ্ছি!'

গাড়ির পেছনের আসনটা ওকে দেখালেন নানী। 'ওখানে গিয়ে বসো। এক্ষুণি বাড়ি ফিরব আমরা।'

গাড়িতে উঠে বসল অ্যানি। গাড়ি তো নয় যেন শবযান, লম্বা এবং নিচু। এ গাড়িটি গ্র্যান্ডপা'র খুব পেয়ারের জিনিস ছিল। অ্যানির মনে আছে পালিশ করতে করতে এ গাড়িটি নতুনের মত তকতকে, ঝকঝকে করে তুলতেন তিনি। কিন্তু বর্তমানে যে লোক গাড়িটি তত্ত্বাবধানে রয়েছে, সে যে এটির তেমন যত্ন নেয়না তা বোঝাই যাচ্ছে। চামড়ার আসন জায়গায় জায়গায় ছেঁড়া। অ্যানি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল পাথুরে দৃষ্টিতে। ওরা ওকে নিয়ে যেতে দেরী করেছে, তাই শাস্তি হিসেবে নানীর সঙ্গে কম কথা বলবে ঠিক করেছে অ্যানি।

'তোমাকে দেখে কী যে ভাল্লাগছে আমার!' সামনের সিটে বিপুল শরীর নিয়ে কোনমতে বসেছেন নানী। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে আর এই ফাঁকে বকবক জুড়ে দিয়েছেন তিনি। 'তুমি দেখতে অবিকল তোমার মায়ের মত হয়েছো।'

অ্যানি মোটেই তার মায়ের মত দেখতে হয়নি। কারণ তার মা রোগা, হালকা-পাতলা, চুলের রঙ তামাটে। আর অ্যানি মোটাসোটা, তার চুলের রঙ ম্যাড়মেড়ে বাদামী। নানী যে ওকে খুশি করতে কথাটা বলেছেন বোঝাই যায়। সে নানীর কথায় কান না দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল, সাঁ সাঁ করে পেছন দিকে ছুটে যাচ্ছে রাস্তা, নিঃশব্দে রাস্তায় ঝরে পড়ছে শুকনো পাতা, মাঝে মাঝে ক্যাঁচ কোঁচ করে উঠছে গাড়ির কড়ি-বর্গা।

যেতে যেতে অনেক বাড়ির দরজায় কুমড়ো ঝুলতে দেখল অ্যানি। আজ যে হ্যালোউইন। মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে কিম্ভূতকিমাকার সব চরিত্রের আদলে সাজিয়ে দিচ্ছেন।

'আসন্ন ঝড়ের মত থমথমে অবস্থা, তাই না নাথান?'

'হুম্।'

অ্যানি কিছু বলল না, চুপ করে রইল।

'আর একঘন্টা পরেই রাস্তাঘাট সব ভরে যাবে।'

'কী দিয়ে?' নিঃশ্বাস চেপে রেখে জানতে চাইল ও। 'রক্তে?'

'আরে নাহ্। পাড়া-পড়শিদের বাচ্চা-কাচ্চাদের ভিড়ে। ট্রিক অর ট্রিট। গ্র্যাডি যমজদের কথা মনে আছে তোমার? জো এবং জ্যাকি? তুমি আসছ ওদেরকে বলেছি আমি। ওরা সাপারের পরে এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। ওদেরকে তোমার খুব পছন্দ হবে। ওরা খুব ভাল।'

'হুম্‌ম,' নাথানের গলা শুনে মনে হল সে নানীর কথা বিশ্বাস করেনি। 'ওরা সত্যি আসবে কিনা সন্দেহ আছে আমার।'

'বোকার মত কথা বলো না। আমরা তো আর একা একা ওকে রাতের বেলা

বেরুতে দিতে পারি না, পারি কি? অন্তত গত বছরের সেই ভয়ঙ্কর রাতের ঘটনার পর থেকে।'

কান খাড়া করল অ্যানি।

'গত বছর কী ঘটেছিল?' জানতে চাইল ও।

'এই একটা ঝামেলা হয়েছিল আর কী,' নানীর কণ্ঠে জড়তা। 'ওসব তোমার শুনে কাজ নেই।'

অ্যানির চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ডন সবসময় ওকে বলে 'নিজের চরকায় তেল দাও,' নানীর মাথার পেছনে থমথমে দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে। ওকে কেউ শিশু ভাবলে ওর খুব রাগ হয়।

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করেই অচেনা দুটো ছেলেকে আসতে বলেছ বাড়ি থেকে আমাকে নিয়ে যেতে।' বলল ও। 'কীসের জন্য?'

'ওই যে বললাম ট্রিক অর ট্রিটিং-এ যাবে। তোমার পরীর ড্রেসটা আমি বের করে রেখেছি। তোমার গায়ে মানিয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমি কোথাও যাচ্ছি না,' কঠিন গলায় বলল অ্যানি। 'বাসায় গিয়ে ঘুমাবো। কারণ আমি খুব ক্লান্ত এবং বিরক্ত। হ্যালোউইন জাহান্নামে যাক।'

দৃষ্টি বিনিময় করলেন নানী এবং নাথান। গাড়ি চলেছে স্টিলওয়াটার লেকের তীর ঘেঁষে। এ হ্রদের পানি কাকের চক্ষুর মত কুচকুচে কালো, স্থির, নিস্তরঙ্গ। এজন্যই বোধহয় এ শহর পত্তনকারীরা নাম দিয়েছিল স্টিলওয়াটার লেক। রাস্তার বাতির আলোয় পান্নার মত জ্বলজ্বল করছে লেকের পানি। ওরা মেইন স্ট্রিটে ঢুকে পড়ল, পাশ কাটাল দোকানপাট, গির্জা, স্কুল, লাইব্রেরী, সবশেষে ম্যাপল স্ট্রীটে মোড় নিল।

'এই তো এসে পড়েছি,' হাসিমুখে বললেন নানী।

বাইরে তাকাল অ্যানি। ছোট শহরটি ওকে খুব একটা উৎসাহিত করতে পারেনি। রাস্তার কিনারে একটি অদ্ভুত বাড়িতে নজর আটকে গেল। ভাঙাচোরা, হতচ্ছাড়া দশা বাড়িটির, গাছপালা শোভিত পরিচ্ছন্ন রাস্তার ধারে খুবই কুৎসিত লাগছে ওটাকে। বাড়ির সামনে ঝোপঝাড়ে একটা বাগান।

বাড়িটির একটি জানালায় আলোর রেখা দেখতে পেল অ্যানি। জানালার পেছনে, পিঙ্গলকেশের শুকনা এক মহিলা টেলিভিশনের সামনে বসে উল বুনছে।

ওই জানালাটির বাইরে দাঁড়িয়ে অ্যানির বয়সী একটি মেয়ে ভেতরে উঁকিঝুঁকি দেয়ার চেষ্টা করছে। অ্যানিদের গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এসেছে, শব্দ শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। হেডলাইটের আলোয় তার মুখ দেখে মনে হল জন্ডিসে ভুগছে সে; করুণ এবং বিষন্ন চেহারা। অ্যানি তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে ছেঁড়া জামা পরা মেয়েটি হাত নাড়ল। বিস্মিত অ্যানি প্রত্যুত্তরে হাত নাড়ল।

'কাকে হাত নাড়ছ?'

'একটা মেয়েকে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন গ্র্যানি। ড্রাইভওয়েতে গাড়ি ঢুকিয়ে দিয়েছিল নাথান। ব্রেক কষল গ্র্যানীর বাড়ির সামনে এসে।

'কই, কাউকে তো দেখছি না,' বললেন তিনি।

গ্র্যানীর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল অ্যানি। চলে গেছে মেয়েটি।

'ওই তো ওখানে ছিল। আমি পরিস্কার দেখেছি ওকে। কিনারের ওই বড় বাড়িটার জানালায় তাকিয়ে ছিল।'

'এ রাস্তায় কোন মেয়েটেয়ে থাকে না,' বললেন নানী। 'তুমি কাউকে দেখতে পাচ্ছ, নাথান?'

'নাহ্।'

'হয়তো শহরের অন্য কোন মহল্লা থেকে এসেছে।'

'তাতে কী হল?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

'বদমায়েশী করার মতলব নিয়ে এসেছে হয়তো।' বললেন নানী। 'লোকের জানালায় উঁকি দেয়া মোটেই ভালো কাজ নয়। শেরিফকে ঘটনাটা জানাতে হয়।'

ওরা গাড়ি থেকে নেমেছে, নাথান পা বাড়াল গাড়ির ট্রাংক খুলে ব্যাগ ব্যাগেজ নিতে, রাস্তায় উদয় হলো পুলিশের টহল গাড়ি, নানী হাত নেড়ে থামতে বলছে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মাথায় শেরিফের ক্যাপ, এক লোক মুখ বাড়িয়ে দিল তার কাঁচ নামানো গাড়ির জানালা দিয়ে। লোকটার মুখে, বাম চোখের নিচ থেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত ইঞ্চিতিনেক লম্বা একটা কাটা দাগ। হাসার সময় কুঁচকে গেল ক্ষতটা। লোকটাকে দেখে নানীর বিশাল শরীরের পেছনে লুকিয়ে গেল অ্যানি।

'হেই, মার্থা, তোমার জন্য কী করতে পারি?'

'এমি উইলিয়ামসদের জানালায় একটা মেয়েকে উঁকি মারতে দেখেছে অ্যানি। তুমি একবার খোঁজ নিয়োতো। আমাদের মহল্লায় চুরি-ডাকাতি হোক তা আমরা চাই না।'

'নেবো, মার্থা। তবে শহরের সব ছেলেমেয়ে আজ ছদ্মবেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। আর জানোইতো আমাদের লোকবলও কম।'

'মেয়েটা ছদ্মবেশে ছিল না,' নানীর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলে অ্যানি। 'ওর পরনে পুরানো সাধারণ একটা সুতির ড্রেস ছিল, মাথায় হ্যান্ডব্যান্ড জাতীয় একটা জিনিস।'

'এই-ই সেই অ্যানি?'

'তাছাড়া আর কে?' বললেন নানী।

'একদম ওর মায়ের চেহারা পেয়েছে। আশা করি মায়ের মত অমন বদমেজাজী ও নয়।' ষড়যন্ত্র করার ভঙ্গিতে অ্যানির দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল শেরিফ। 'তোমার মা ছিল আতংক বিশেষ।' গ্লাভস পরা একটা হাত দিয়ে স্যালুটের ভঙ্গি করল সে,

তারপর গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

অ্যানির নানী নাতনীর হাত ধরলেন, দেখলেন শেরিফের গাড়ির লাল টেলনাইট মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'জোনাস তোমার মাকে খুব পছন্দ করত,' বললেন তিনি। 'ওকে বিয়ে করলেই ভালো করত সে। কিন্তু তোমার মা কোনদিনই বুঝতে চায়নি কীসে তার ভাল হবে। সবসময় অস্থির।'

ঝাঁকি মেরে হাত ছাড়িয়ে নিল অ্যানি। মা'র সম্পর্কে কেউ মন্দ কিছু বললে ওর রাগ হয়। মাকে সাংঘাতিক মিস করছে ও। মা'র সঙ্গে যদি এ মুহূর্তে থাকতে পারত অ্যানি, আর কিছুই চাইত না।

নানী ওকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমের কল্যাণে হলঘরের টেবিলের ওপর রাখা ফোন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে। সুইটজারল্যান্ড থেকে লং ডিসট্যান্স কল।

'মেরী বেথ বলছিস?' এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন নানী যে অ্যানির মনে হল টমাস আলভা এডিসনের আবিস্কৃত এ যন্ত্রটির সাহায্য ছাড়াই তাঁর কথা পৌঁছে যাবে সুদূর ইউরোপে।

'না, আমি তোকে ফোন করব না, বেথ। এমন অদ্ভুত কথা জীবনেও শুনিনি। হ্যাঁ, ও আছে এখানে। কথা বলবি?'

অ্যানির হাতে রিসিভার দিয়ে তিনি নির্লজ্জের মত রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মা-মেয়ের কথা শোনার জন্য। মাউথপিসে হাত চাপা দিল অ্যানি।

'তুমি কি একটু অন্য ঘরে যাবে?' বলল ও। 'আমি মা'র সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা বলব।'

চোখ কপালে উঠল নানীর। ঠোঁট কামড়ে ধরলেন তিনি। তারপর একটিও কথা না বলে গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরলেন, দুপদাপ পা ফেলে ঢুকলেন কিচেনে।

ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল অ্যানি।

দুই

'মা?' ফোনে হিসিয়ে উঠল অ্যানি। 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও। আমি এই গর্তের মধ্যে থাকতে পারব না।'

'কামঅন, ডার্লিং,' অনড় শোনাল মা'র কণ্ঠ। 'বাসাটা অতটা খারাপ না। মাত্র তো এলি। ক'টা দিন থাক।'

'এ বাড়িতে আমার আসা হত কিনা তা'ই সন্দেহ। ওরা আমাকে অনেকক্ষণ দাঁড়া করিয়ে রেখেছে প্লাটফর্মে। চিন্তা করো, অন্ধকারে আমি একা দাঁড়িয়ে আছি। কেউ যদি আমাকে খুন করে ফেলত!'

'স্টিলওয়াটারে?' হেসে উঠল ওর মা। 'ওখানে খুনখারাবীর ঘটনা ঘটে না।'

অ্যানির মা আর তার স্বামী বিলাসবহুল একটা হোটেলে উঠেছে। সে মেয়ের সঙ্গে যখন কথা বলছে ওই সময় তার সুদর্শন স্বামীটি ত্বকে আফটার শেভ লোশন লাগাতে ব্যস্ত।

'প্লীজ, মা,' কাতর গলায় বলল অ্যানি। 'আমার মনে হচ্ছে এরা আমাকে নিয়ে মশকরা করছে। চিন্তা করতে পারো গ্র্যানি আমাকে বলছে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ট্রিক-অর-ট্রিটিং-এ যেতে! অথচ তাদেরকে আমি চিনিও না!'

'যাচ্ছিস না কেন? গেলে মজাই পাবি,' খিলখিল করে হেসে উঠল মা। অ্যানি কল্পনায় দেখতে পেল সৎবাবা মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে ঘাড়ে নাক ঘষছে।

'হাড় জমে যাওয়া শীতের মধ্যে হাস্যকর ছদ্মবেশ নিয়ে আমি খেলতে যাব?' গলা চড়াল অ্যানি। 'অসম্ভব!' একটু থেমে বলল, 'তোমাকে খুব মিস করছি, মা।' তার চোখে জল এসে গেছে। 'তুমি আমাকে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন?'

'অ্যান, এরকমভাবে এর আগেও বহুবার আমরা দেশের বাইরে গেছি। ডন আর আমি এসেছি ব্যবসার কাজে। তুই এখানে এলে মোটেই ভাল লাগতো না তোর।'

'তুমি কী করে জান? তুমি তো কোনদিন আমাকে তোমাদের সঙ্গে বাইরে নিয়ে যাওনি।'

'ফর হেভেনস সেক, অ্যান, তোর ধারণাও নেই তুই কতটা সৌভাগ্যবতী। আমেরিকার অন্যতম নামীদামী স্কুল মেফিল্ড। তোকে ওখানে পড়ানোর জন্য ডনের অনেকগুলো টাকা লাগছে। তোর বরং ওর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।। জানি না কেন এখন এসব আবোলতাবোল বলছিস। ছুটিটা নানুর সঙ্গে ওখানে কাটাবি এ শর্তে তো তুই-ই রাজি হয়েছিলি।'

'আমি রাজি হইনি। তোমরা জোর করেছিলে। তুমি আর সে। তুমি আমার কথা শুনতেই চাও না। আমার চাওয়া-পাওয়া নিয়ে তোমার একটুও মাথাব্যথা নেই।'

'লং ডিসট্যান্স কলে তোর সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছে আমার নেই, সোনা। অনেকগুলো টাকা যাচ্ছে। থ্যাংকসগিভিং ডে'তে তুই বাড়ি ফিরতে পারিস। আমি ফিরে এসে মেফিল্ডে যাব। তখন এসে বিষয়টি নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলি?'

'মেফিল্ড আমি ঘেন্না করি,' চিৎকার দিল অ্যানি। 'আর ঘেন্না করি ওকে। তুমি আমাকে একটুও ভালবাসো না। আমি মরে গেলেই ভাল হবে।'

দুম করে ফোন রেখে দিল অ্যানি, থরথর করে কেঁপে উঠল ক্রেডল।

'অ্যাই, অ্যাই, অ্যাই', রান্নাঘরের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন নানী, হাতে ছোট চিনামাটির প্লেটে একখণ্ড পাই। 'হ্যালোউইন ডে'তে অমন অলক্ষুণে কথা বলতে নেই।'

'তুমি আড়ি পেতে আমাদের কথা শুনছিলে,' রাগে বিট-মূলের মত লাল হয়ে গেল অ্যানি।

'অমন চেঁচিয়ে কথা বলছিলে তুমি, না শুনে উপায়?' বললেন নানী। 'তবে আমি আড়িটাড়ি পাতিনি। তোমাকে কুমড়োর পাই দিতে আসছিলাম।'

'কুমড়োর পাই আমার দু'চক্ষের বিষ,' গলা ফাটাল অ্যানি, টান মেরে নানীর হাত থেকে প্লেটটা নিল। তারপর সজোরে ছুঁড়ে মারল। মিসেস জনস্টনের কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে ছুটে গেল ওটা, বাতাস লেগে নানীর চুল উড়ল, রান্নাঘরের দরজা পার হয়ে ফ্রিজের গায়ে বাড়ি লেগে ঝনঝন শব্দে ভাঙল প্লেট। টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয় আর হলুদ পাই লেপ্টে গেল ফ্রিজের গায়ে, যেন কোন বাচ্চা ছেলে হাত দিয়ে যা ইচ্ছে তা-ই রঙ মেখে রেখেছে ওখানে!

দম বন্ধ করা নীরবতা নেমে এল ওখানে এক মুহূর্তের জন্য, মস্ত একটা অপরাধ করে ফেলেছে বুঝতে পেরে এবং এ জন্য কপালে যে কী দুর্ভোগ রয়েছে অনুমান করে ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেল অ্যানির। সে এক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে গেল নাথানের সঙ্গে। সে সিঁড়ি বেয়ে নামছিল।

'এত তাড়া কীসের? আগুন লেগেছে কোথায়ও?' জিজ্ঞেস করল নাথান।

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে ওপরে উঠতে লাগল অ্যানি।

'তোমার মা'র পুরানো ঘরটা তোমার জন্য গুছিয়ে রেখেছি,' হাঁক ছাড়ল নাথান। 'ডানদিকের প্রথম কামরা।'

দড়াম করে বেডরুমের দরজা বন্ধ করল অ্যানি, ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বিছানায় তারপর হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল।

মুখে কৃত্রিম হতাশভাব ফুটিয়ে নানী এলেন নাতনীর পেছন পেছন, দরজা খুলে উঁকি দিলেন ভেতরে।

'এত মেজাজ দেখাতে হয় না, লিটল লেডি,' বললেন তিনি। 'যতক্ষণ না কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হচ্ছো, ওখানেই পড়ে থাকো।'

দরজায় তালা মেরে তিনি ফিরে এলেন রান্নাঘরে। নাথান মেঝে থেকে প্লেটের ভাঙা টুকরো তুলছে।

'একদম মায়ের মেজাজ পেয়েছে,' বললেন গ্র্যান্ডমা।

'যেমন মা, তেমন মেয়ে,' মন্তব্য করল নাথান।

'এত কষ্ট করে রান্না করা পাইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল,' মিসেস জনস্টন এক টুকরো কাপড় নিয়ে ফ্রিজের গায়ে লেগে থাকা আবর্জনা মুছতে লাগলেন। 'ও ওর ঘরেই থাকুক কিছুক্ষণ। খিদে পেলে নিজেই আসবে।'

অ্যানির আকুল ক্রন্দন আস্তে আস্তে গোঙানি, সেখান থেকে ফোঁপানি, সবশেষে নাক টানার শব্দে পরিণত হলো। কেউ ওর কান্নাকাটি পাত্তা দিচ্ছে না দেখে চিৎ হয়ে শুয়ে রইলো ও, তাকিয়ে রইল নানাভাই'র আঁকা চাঁদ-তারা মার্কা ছাতের দিকে। তারপর হোল্ডঅল খুলে খেলনা কুকুর সুইটোকে বের করে বুকের মধ্যে চেপে ধরে থাকল।

একটা অদ্ভুত শান্তি অনুভব করল ও। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থেকে বিছানায় উঠে বসল অ্যানি। পা ঝুলিয়ে দিল খাটের কিনারে। মা'র ঘরটা যদ্দুর মনে পড়ে এরকম ছোটই ছিল, আর কোন কিছু পরিবর্তন করা হয়নি এখানে। ঘরের গন্ধটাও আগের মতই।

ঘরে জানালা দুটো। বড় জানালাটি রাস্তার দিকে মুখ ফেরানো, ছোটটি দিয়ে তাকালে পেছনের বাগান চোখে পড়ে। অ্যানির মনে আছে বাগানে একটি লম্বা উইলো গাছ ছিল।

দুটো জানালাতেই হলুদ পর্দা ঝুলছে, বিছানার চাদর এবং ল্যাম্পশেডও একই রঙের। দেয়ালে রূপকথার গল্পের ওয়ালপেপার লাগানো। সিনড্রেলা আর স্নো হোয়াইটের ছবিওয়ালা ওয়ালপেপার।

সুইটোকে বগলে চেপে ধরে খাট থেকে নামল অ্যানি। সোনালী রঙের পুরানো কার্পেটে পায়চারী করতে লাগল। নানীর সঙ্গে বাজে ব্যবহার করে ফেলেছে বলে এখন লজ্জা লাগছে। ভাবল নিচে গিয়ে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু মনে পড়ল নানু দরজায় তালা লাগিয়ে গেছেন। বেরুনো যাবে না। ও ম্যাপল কাঠের ড্রেসিং টেবিলটার সামনে চলে এলো। গ্র্যানি টেবিলের ওপর বাগান থেকে তুলে আনা একগুচ্ছ তাজা ফুল রেখেছেন। ঝুঁকে গোলাপ ফুলের গন্ধ নিল অ্যানি। ফুলের বাটির পাশে, রূপোলী ফ্রেমে বাঁধানো একটি ছবিতে ওর দৃষ্টি আটকে গেল। ফ্রেমটি হাতে নিয়ে তাকাল অ্যানি।

ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ। তিনজন মানুষকে দেখা যাচ্ছে ছবিতে, হাতে হাত ধরে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। একজন লম্বা মানুষ, বয়স হবে ৪১/৪২ (নিঃসন্দেহে ওর গ্র্যানী) কালো, ঝলমলে চুল আলগা হয়ে পড়ে আছে দুই কাঁধে, আর তাদের মাঝখানে মোটাসোটা, সাদামাটা চেহারার একটি মেয়ে যার সঙ্গে অ্যানির অবয়বের অদ্ভুত মিল রয়েছে।

এটা নিশ্চয় তার সুন্দরী, স্ফূর্তিবাজ মায়ের ছবি নয়? যদি তাই হয় তবে বলতেই হবে মা আমূল বদলে ফেলেছে নিজেকে। অ্যানির সবসময়েই অবাক লাগত ভেবে মা'র কাছে পারিবারিক কোন ছবি নেই কেন? মা তার ছোটবেলাকার গোবেচারা টাইপের চেহারা মেয়েকে দেখতে দিতে চায়নি বলেই সমস্ত ছবি সরিয়ে ফেলেছে।

অ্যানিও কি তার মায়ের মত সুন্দরী হতে পারবে?

আয়নায় নিজেকে দেখল ও। দেখতে মোটেই ভাল লাগছে না। ওর চেহারার মধ্যে একমাত্র সম্পদ সুন্দর চোখজোড়া। কান্নাকাটির ফলে লাল টকটকে। ওর গায়ের রঙও খুব ফর্সা না। আর ওর চুল... ওর পেছনে, কালো আকাশের পটভূমে ফুটে থাকা উইলো গাছটি যেন সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়ে রইল ওর দিকে।

নিচ থেকে ভেসে এল উচ্চকিত হাসির আওয়াজ।

সামনের জানালায় গিয়ে উঁকি দিল অ্যানি। কতগুলো বাচ্চা ছেলেপেলে, নানান রঙবেরঙের পোশাক পরনে, হাসতে হাসতে আর গল্প করতে করতে হেঁটে যাচ্ছে

ম্যাপল স্ট্রিট দিয়ে। ওরা চলে যাওয়া পর্যন্ত জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রইল অ্যানি। তারপর ঘুরল। সুইটোকে মুখের সামনে ধরে ভয়ংকর গলায় বলল, যেন কুকুরছানাটা মানুষ, 'ওদেরকে দরকারটা কী?' ও আবার ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটি তুলে নিল হাতে। ছবির তিনজন মানুষকে খুব সুখী এবং স্বাভাবিক লাগছে। অ্যানি কেন এরকম একটি পরিবার পেল না? নিজের অজান্তেই চোখে জল এসে গেল ওর। নিজের ওপর রাগ হল খুব, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল।

ও ঘরে একা নয়।

আয়নায় আরও কার যেন ছায়া পড়েছে। আরেকটি মুখ ওর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারছে।

গায়ে গরম পানি পড়া বিড়ালের মত কঁকিয়ে উঠল অ্যানি। পাঁই করে ঘুরল, হাত থেকে ছবিটি মেঝেতে পড়ে ঠনঠন শব্দ তুলল।

মুখখানা জানালার বাইরে, যেন ভেসে রয়েছে শূন্যে। কংকালের মত সরু, কোটরে ঢোকা চক্ষু প্রায় দেখাই যায় না, এরকম ভয়ংকর চেহারা শুধু দুঃস্বপ্নেই হানা দেয়। আর এ মুখটিই অ্যানি দেখেছিল সেই বড় বাড়িটার জানালায় উঁকি দিচ্ছে। মেয়েটির নোংরা, চটচটে সোনালী চুল ঘিরে রেখেছে কুয়াশার ভৌতিক, অপার্থিব একটা বৃত্ত।

অ্যানি ফটোটি তুলতে উবু হয়েছে, জানালার মেয়েটি হাড্ডিসার একটি হাত তুলে ইশারায় ডাকল।

ঠোঁটে আঙুল রাখল অ্যানি, ইঙ্গিতে মেয়েটিকে কথা বলতে মানা করছে। তারপর পা টিপেটিপে মেয়েটির সামনে চলে এল ও।

'তুমি পাগল নাকি?' ফিসফিস করল অ্যানি। 'ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছিল।'

'তুমি বাইরে যাবে কিনা জানতে এসেছিলাম।'

মেয়েটি, প্রথম দর্শনে যাকে মনে হচ্ছিল ভেসে আছে শূন্যে, এখন বোঝা গেল সে উইলো গাছের একটি ডালে বসে আছে। সুতির স্কার্টের নিচে তার নগ্ন পা দু'খানি খড়ের মত দুলছে।

'যাবে বাইরে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি। 'নাকি এখানে দাঁড়িয়ে ভ্যাজর ভ্যাজরই করবে?'

'আমি বেরুতে পারব না,' করুণ গলায় বলল অ্যানি। 'আমার গ্র্যানি আমাকে বাইরে থেকে তালা মেরে রেখেছে।'

'কেন?'

'কারণ উনি একটি বুড়ো বাদুড়, তা-ই!'

'উঁহু, লোকে খামোকা কাউকে ঘরে তালা মেরে রাখে না। আমি জানি। কারণ আমার জীবনে এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে।'

'আচ্ছা, স্বীকার করছি খামোকা আমাকে তালা মেরে রাখা হয়নি,' বলল অ্যানি।

'তবে বিরাট কোন অন্যায়ও আমি করিনি। শুধু অখাদ্য কিছু কুমড়োর পাই তাঁর দিকে ছুঁড়ে মেরেছিলাম।'

'কুমড়োর পাই? তুমি দেখছি একটা পাগল। কুমড়োর পাই আমার যা প্রিয়!'

'ধ্যাত। ওই জিনিসটা দেখলেই ঘিনঘিন করে গা।'

'আচ্ছা, পরেরবার আমার জন্য কিছু পাই রেখে দিয়ো, কেমন?'

'রাখবো। না খেয়ে মরে যেতে রাজি তবু কুমড়োর পাই আমি মুখে তুলবো না।'

'বুঝলাম,' বলল মেয়েটি। 'তুমি যদি বেরুতে না পারো আমি কি ভেতরে আসতে পারি? বাইরে খুব ঠাণ্ডা। গাছের ডালে বসে থেকে কোন আরাম পাচ্ছি না।'

অ্যানি উদ্বিগ্ন চোখে একবার ফিরে দেখল।

'ঠিক আছে।' বলল ও। 'এসো। তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। একদম চুপ হয়ে থাকতে হবে কিন্তু। দুষ্টু ডাইনি বুড়িটা টের পেলে কিন্তু আমার জ্যান্ত ছাল ছাড়াবে!'

তিন

নিচতলায় দুষ্টু ডাইনিটা কমলালেবুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন। এমন সময় ওপরতলায় ফটো ফ্রেম মেঝেয় আছড়ে পড়ে ঝনঝন শব্দ তুলল। দারুণভাবে চমকে গেলেন তিনি।

'কীসের আওয়াজ হলো?' শব্দের উৎসমুখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মিসেস জনস্টন।

দাঁত বের করে হাসল নাথান। 'রাতের বেলা যেসব জিনিস শব্দ করে।'

'ঘরটার বারোটা বাজাচ্ছে না তো ও?' শংকা প্রকাশ করলেন নানী। 'ওর ঘরের দরজা খুলে দেব? কতদূর থেকে এসেছে মেয়েটা এখনো কিচ্ছু মুখে দেয়নি।'

নাথান রসুনের কোয়া ভেজাচ্ছিল ব্র্যান্ডিতে, 'অ্যানি আরও আধঘন্টা ঘরে আটকা থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। দেখে তো মনে হল না ওর খিদে পেয়েছে,' বলল সে।

'হয়তো বা। হাতের কাজটা শেষ করে ওর জন্য কোকো আর বিস্কিট নিয়ে যাব।'

কিন্তু ওরা কেউ জানল না ওদের ওপরতলায় কী ঘটতে চলেছে।

'তোমার ঘরটি তো বেশ আরামের!' অ্যানির গোপন দর্শনার্থী হাঁটুর কাছে তার স্কার্ট আঙুল দিয়ে সমান করতে করতে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল চারপাশে। 'আমার ঘর তোমারটার অর্ধেকও হবে না আয়তনে, আর এত সুন্দর তো নয়ই।'

বিছানায় বসল সে আরাম করে, চাদরে মৃদু চাপড় মেরে ইশারা করল অ্যানিকে ওর পাশে এসে বসতে।

'মোটামুটি আর কী,' বলল অ্যানি। 'তবে আমার জন্য খুব বেশি ছেলেমানুষী ঘর। এটা আসলে আমার মা'র কামরা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। শেষ যেবার এখানে

ছিলাম আমি তারপর থেকে ঘরটির কোন পরিবর্তন করা হয় নি।'

'সেটা কবেকার কথা?'

'নয় বছর আগে। তখন আমার বয়স ছয়।'

'এ জন্যই তোমাকে আমি আগে দেখিনি,' ঠোঁট কামড়াল মেয়েটা।

'আমরা এখানে এসেছি বছর দুই হল। নাকি তারও আগে?' ভুরু কুঁচকে মনে করার চেষ্টা করল সে। মনে পড়ছে না বলে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গি করল। সরু, সাদা হাতটি বাড়িয়ে দিল সে।

'আমি এমি,' বলল মেয়েটি। 'এমি উইলিয়ামস। তোমাকে আসতে দেখলাম।'

অ্যানি বাড়ানো হাতখানা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল, মরা মাছের মত ঠাণ্ডা হাত।

'অ্যানি গ্রসভেনর।' নিজের পরিচয় দিল ও।

বিবর্ণ, বিষন্ন মুখটির দিকে তাকাল অ্যানি, হঠাৎ মনে হলো দেয়ালগুলো সরু হয়ে যাচ্ছে, ঢালু হয়ে যাচ্ছে মেঝে। একবার কানে ইনফেকশন হয়েছিল ওর। তখন এরকম অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল। ওর মনে হচ্ছে এমির মুখটা যেন গলে যাচ্ছে। এমির শরীরের ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছে ও, মাথার খুলি ভেদ করে চলে যাচ্ছে দৃষ্টি।

হঠাৎই ঘরের বাইরে নিজেকে আবিষ্কার করল অ্যানি, কিংবা বলা যায় শরীরের অর্ধেক অংশ। বাকি অংশ এখনো রয়ে গেছে ঘরের ভেতরে। একজন দর্শক যেন দু'টা বিকল্প পৃথিবীতে ভেসে বেড়াচ্ছে। যেন দুজন মানুষ এক হয়ে গেছে। তার একজন দেখছে, অপরজন জলেভেজা ঘাসের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

তখন 'অপরজন' তাকে দখল করল এবং যেন দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল সে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, অঝোর ধারায় ঝরছে বৃষ্টি, বুলেটের মত বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তার খোলা মাথায়। সদ্য জন্ম নেয়া কুকুরছানার মত যেন অন্ধ সে, টের পাচ্ছে পাঁক থেকে পা তোলার ব্যর্থ চেষ্টার জের হিসেবে বুকের খাঁচায় ধড়াশ ধড়াশ বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। মাথার ওপরে গুড়ুম গুড়ুম শব্দে হুংকার ছাড়ল বজ্র, বিদ্যুতের একটা চাবুক ঝলসে উঠল আকাশে, ঠিক তখন সে সচেতন হয়ে উঠল। মিশমিশে কালো একটা ছায়ামূর্তি ধীরে ধীরে উঠে আসছে মাটির নিচ থেকে।

এমনসময় বেজে উঠল ডোরবেল, গুলতির মত এদিক-ওদিক ছিটকে যেতে লাগল ও, হোঁচট খেল জানালায়, মাথাটা ঘুরছে বনবন করে, নিচের রাস্তায় তাকাল ও।

সিঁড়িতে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দুটি মূর্তি। প্রাপ্তবয়স্কদের সমান লম্বা তাঁরা, দুজনের পরনে একইরকমের পোশাক। ইভনিং স্যুট, স্কারলেট স্যাটিনের লাইন দেয়া ক্রেপ এবং থাবা।

অ্যানি নিচে তাকিয়েছে, মূর্তি দুটো একসঙ্গে ওর দিকে মুখ তুলে চাইল, যেন ওর উপস্থিতি টের পেয়েছে। লাল টকটকে রঙ করা মুখ দুটো হাসল, রাস্তার আলো পড়ে চকচক করে উঠল তাদের সূচালো দাঁত। মাথায় কালো পরচুলা, সুতোয় নাচানো

পুতুলের মতো লাগছে তাদেরকে। অশুভ। গা ছমছমে। শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল অ্যানির। দ্রুত পিছিয়ে এল জানালার সামনে থেকে।

ওর হাত কেমন টনটন করছে, যেন বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে। পিছু হঠতে হঠতে আঙুল দিয়ে হাতটা ম্যাসেজ করতে লাগল অ্যানি। এমির মুখোমুখি বিছানায় বসল।

'বললে বিশ্বাস করবে না,' হালকা গলায় বলতে চাইল অ্যানি, 'দরজায় এইমাত্র দুইটা ভ্যাম্পায়ার দেখলাম।'

ওর নতুন বন্ধু ব্যাপারটা মোটেই হালকাভাবে নিল না, ভয়ের চোটে খামচে ধরল অ্যানির হাত। কেউ যেন ওকে চিমটি কেটেছে সেরকম একটা ভাব ফুটল চেহারায়, রক্তশূন্য মুখ।

'ডাবল ট্রাবল,' শুকনো গলায় বলল সে।

নিচে হলওয়েতে মৃদু পদশব্দ হলো, তারপর শোনা গেল ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ, খুলে গেছে সদর দরজা। নানী স্বাগত জানালেন তাঁর বাড়ির প্রথম দর্শনার্থীদের।

'জো, জ্যাকি,' বললেন তিনি। 'তোমরা তো দারুণ সেজেছো। কী করবে? ট্রিক নাকি ট্রিট?'

'অ্যানি আমাদের সঙ্গে যাবে কীনা খোঁজ নিতে এসেছিলাম।'

এমির মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল, অ্যানির বাহুতে তার হাতের চাপটা বাড়ল, মানা করার ভঙ্গিতে প্রবলবেগে মাথা নাড়তে লাগল।

'দুঃখিত ছেলেরা,' অম্লান বদনে মিথ্যা কথা বললেন নানী। 'অ্যানির খুব ঠাণ্ডা লেগেছে। আজ আর যেতে পারবে না।'

'ধ্যাত্তেরী,' বলল একটি ছেলে।

'ও পরে পার্টিতে যাবে। তখন ওর সঙ্গে তোমাদের দেখা হবে। মিষ্টি খাবে?'

'না, মিসেস জনস্টন। যাই তাহলে?'

অ্যানি কল্পনায় দেখল সাদা মোজা পরা হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে ভ্যাম্পায়ার দুটো। নিচতলার দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো। নানী পায়ের আওয়াজ তুলে ফিরে গেলেন রান্নাঘরে।

এমি অবশেষে ছেড়ে দিল অ্যানির হাত। ও যেখানে খামচে ধরেছিল সে জায়গাটা ডলতে লাগল অ্যানি। কাল যে ওখানটায় দাগ পড়ে যাবে সে ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

'তোমার হয়েছেটা কী?' হিসিয়ে উঠল ও।

'ও দুটোর ধারেকাছেও ঘেঁষো না,' বলল এমি। 'সত্যিকারের বদমাশ দুটো। বড়দেরকে বোকা বানিয়ে মজা পায়। এমন ভাব করে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু অন্ধকার গলিতে যদি তোমাকে একা পেয়ে যায় তো...'

'আমার সঙ্গে লাগতে আসুক, বুঝিয়ে দেব মজা।' বলল অ্যানি। ওর কোন বন্ধু নেই, খেলার সঙ্গী নেই। একা একা বড় হয়ে উঠছে বলে ধাতটাও শক্ত হয়েছে। পরোয়া করে না কাউকে।

'তাহলে চলো প্রমাণ করে দেখাবে।'

'পারব না বললামই তো! আমাকে আটকে রেখেছে।'

'তাতে কী? কেউ আমাকে কখনো আটকে রাখতে পারেনি। আর আমার বাসার জানালার ধারে এরকম কোন গাছও নেই।' এমি জানালার চৌকাঠে পা রাখল, যেভাবে এসেছে সেভাবে নেমে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। 'অবশ্য...তুমি যদি ডরাও...'

'আমি কখনো ডরাই না,' ক্ষিপ্ত গলায় বলল অ্যানি। 'আমার তো পরার কিছু নেই। কস্টিউম লাগবে আমাদের। নইলে সত্যিকারের ট্রিক অর ট্রিট হবে না।'

ওয়াড্রোবের দরজায় ঝুলে থাকা রংজ্বলা পরীর কস্টিউমের দিকে ইশারা করল এমি। 'ওগুলো পরলেই পারো।'

'এগুলো পরলে বিশ্রী লাগবে না?' বলল অ্যানি। 'আমার মায়ের কস্টিউম। তাছাড়া এ কস্টিউম পরে পাঁচ কদমও যেতে পারব না। ধরে ফেলবে শেরিফ। তার সঙ্গে আমার গ্র্যানির খুব দোস্তী।'

'তাহলে চলো ভূত সাজি,' প্রস্তাব দিল এমি। 'বিছানার চাদরে সারা শরীর মুড়ে নেব। তাহলে কেউ আমাদেরকে চিনতেও পারবে না।'

'ফাজলামি হচ্ছে?'

'তাহলে তুমিই বরং বুদ্ধি দাও। এসো। আমি গাছের নিচে তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।' চোখের আড়াল হয়ে গেল সে চোখের পলকে।

'তাড়াতাড়ি মনস্থির করে ফেলো,' শূন্য থেকে ভেসো এলো এমির ভৌতিক কণ্ঠ। 'আমি সারারাত তোমার জন্য দাঁড়িতে থাকতে পারব না।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল অ্যানি।

খোলা জানালা দিয়ে শরতের বাতাস বয়ে আনছে উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের গন্ধ।

কী করবে অ্যানি? বাড়িতে থাকা মানে বিরক্তিকর একটি সন্ধ্যা পার করা, সবার সাথে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হেসে হেসে কথা বলা, তারপর শুতে যাওয়া। নাহ্, এসব করার মোটেই ইচ্ছে নেই ওর। সে জানালা দিয়ে গলা বের করল।

'ওখানেই থাকো,' কর্কশ গলায় ফিসফিস করল অ্যানি। 'আমি আসছি।'

দ্রুত বিছানার চাদর আর কম্বল তুলে ফেলল ও। তারপর নতুন করে বিছানা করল। চাদরের নিচে রাখল যেন দেখলে মনে হয় ও শুয়ে আছে বিছানায়। সুইটোকে হোল্ডঅলের পাশে, চাদরের তলা দিয়ে শুধু কালো কানদুটো বের হয়ে থাকল। তারপর তড়িঘড়ি এগিয়ে গেল জানালায়, চৌকাঠের ওপর দিয়ে দলাপাকানো বিছানার চাদরগুলো ছুঁড়ে মারল নিচে। তারপর চড়ে বসল উইলো গাছে।

একটু পরে নানী এসে হাজির হলেন নাতনীর ঘরে। হাতে কোকো আর বিস্কিটের ট্রে। বেডরুমের নিচে এঁকেবেঁকে শুয়ে থাকা কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। হাতের ট্রেটি ড্রেসিংটেবিলের ওপর রেখে শায়িত শরীরটির দিতে এগিয়ে গেলেন।

'অ্যানি,' ডাকলেন তিনি। 'অ্যানি সোনা। তোমার জন্য সাপার এনেছি।'

কোন সাড়া না পেয়ে তিনি বেডক্লথ ধরে টান দিলেন। দেখলেন বিছানায় শুয়ে আছে সুইটো, পাশে হোল্ডঅল। দারুণ চমকে গিয়ে তিনি ছুটলেন খোলা জানালায়।

একেবারে ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেন তিনি। দেখলেন দুটো মনুষ্যমূর্তি দ্রুত ঢুকে গেল একটা ঝোপের মধ্যে। প্রথমজন যে অ্যানি সে ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। কিন্তু দ্বিতীয়জন কে?

ডাক দিলেন তিনি। মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। রাস্তার বাতির আলোয় পরিস্কার দেখা গেল তার মুখ।

'ঈশ্বর রক্ষা করো!' কাঁপতে কাঁপতে বললেন মিসেস জনস্টন।

জানালা খোলা রেখেই তিনি দ্রুত ছুটলেন নিচতলায়।

চার

'মার্থা, ওটা ও হতে পারে না।'

শেরিফ জোনস তার পেজারে কথা বলছে, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে কফির কাপে আর কামড় বসাচ্ছে ডোনাটে। স্থানীয় একটি খাবারের দোকানে বসেছে। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাতের তালু দিয়ে কপাল মুছল সে।

'হ্যালোউইন। হ্যালোউইনের রাত মানুষকে দৃষ্টি-বিভ্রমের শিকার করে।'

ধোঁয়া ওঠা জাগ থেকে গরম কফি শেরিফের কাপে ঢেলে দিল মেবেলিন লেভেভিয, তার দিকে তাকিয়ে সহানুভূতির হাসি হাসল। শেরিফ মেবেলিনের কব্জিতে মৃদু চাপ দিয়ে ইশারা করল ওকে আরেকটুক্ষণ থাকার জন্য।

'হ্যাঁ, মার্থা, জানি তুমি খুব দুশ্চিন্তা করছ। হ্যাঁ, অবশ্যই খেয়াল রাখবো আমি...না, না ওর মাকে ফোন করা ঠিক হবে না। বেচারী খামোকা চিন্তা করবে।'

ম্যাপল স্ট্রীটের শেষ মাথায় ভাড়া বাড়িটির জানালার ধারে আর্মচেয়ারে বসা উল বুনতে থাকা মহিলাটি চোখ বুজে বিশ্রাম নিচ্ছিল। তার স্বামী বিলি শীঘ্রি বাড়ি ফিরবে। পাশের একটি রাজ্যে গেছে ব্যবসার কাজে। আশা করল বিলির মেজাজ ভাল থাকবে। যদিও এতে সন্দেহ আছে। আজ কোন ঝগড়াঝাঁটি হোক মহিলাটি তা চায় না। আজ রাতে অনেক করুণ স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে তার।

চোখ মেলল সে, তাকাল ব্যুরোর দিকে। ওখানে ফ্রেমে বাঁধানো একটি কিশোরীর ছবি। মেয়েটির চুলগুলো বেশ ঝলমলে, পরনে সুতির পোশাক। মহিলার হঠাৎ ব্যথাতুর একটি ভঙ্গি ফুটল, কোল থেকে উলের কাঁটা খসে পড়ল মেঝেয়, সে ওটা তুলল না, যেমন ছিল তেমনই পড়ে রইল।

প্লাস্টিক কাউন্টার টপে পেজারটি উপুড় করে রাখল শেরিফ। 'মার্থা জনস্টন,' বলল

সে। নিজের কাপে চার চামচ চিনি ঢেলে নিল, 'তার নাতনী অ্যানি বেডরুমের জানালা খুলে পালিয়েছে। তার তখন ফিট হবার দশা।'

'ওনাকে দোষ দেয়া যায় না,' মেবেলিন কাউন্টারে লেগে থাকা পিচ্ছিল শস্যকণা মুছল। 'বিশেষ করে গত বছরের ঘটনার পরে।'

'তবে উনি বলছেন অ্যানি নাকি এমি উইলিয়ামসের সঙ্গে পালিয়েছে।'

লাল চুলের মেবেলিনের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল্।

'বেশি মদ গিলে ফেলেছেন নাকি ভদ্রমহিলা?'

'তাঁর কণ্ঠ শুনে মনে হয়নি তিনি মদ পান করেছেন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন কেবল। হয়তো মানসিক শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।'

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না...' ঝকঝকে একটা গ্লাস ন্যাকড়া দিয়ে খামোকাই মুছছে মেবেলিন। 'মানে...তুমি তো কোন লাশ খুঁজে পাওনি... পেয়েছো কি?'

এক ঢোক কফি পান করল শেরিফ।

'তুমি তো জানই আমরা কিছু পাইনি। জঙ্গলে খুঁজেছি। লেকে ডুবুরি নামিয়েছি। কিন্তু কিছু পাইনি।'

'তাহলে একটা সম্ভাবনা...'

'নেই,' এককথায় নাকচ করে দিল জোনাস। 'তাছাড়া যদি সত্যিও ওটা সে হয়, আমি জানি তা হতে পারে না, সে কেন সোজা নিজের বাড়ি গেল না? কেন মার্থা জনস্টনের বাগানে ঘুরঘুর করছিল?'

'হয়তো ও ভয় পেয়েছিল।' বলল মেবেলিন। 'বিলির কেমন মেজাজ জানোই তো। হতে পারে না ও বাড়ি ফিরতে ভয় পাচ্ছিল?'

'আমি তোমাকে বলছি-এমি উইলিয়ামস কোনদিন বাড়ি ফিরবে না।'

'ওর কী হয়েছে বলে তোমার ধারণা, জোনাস?'

'আমার ধারণা? ও পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর হারিয়ে গেছে। গত বছরের আবহাওয়া ছিল খুবই খারাপ। অমন বিশ্রি আবহাওয়ায় বাইরে বেশিক্ষণ কারও টিকে থাকার কথা নয়।'

'তবু একটা বাচ্চা মেয়ে স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেল সবার চোখের সামনে থেকে, কেমন অদ্ভুত না?'

'খবর দ্যাখো,' করুণ চেহারা নিয়ে মাথা দোলাচ্ছে শেরিফ। 'এরকম হামেশাই ঘটছে।'

'আর ওই মোটরসাইকেল চালক?'

'ও হ্যাঁ, সেই রহস্যময় মোটরসাইকেল আরোহী। ওকে নিয়ে আমার তেমন মাথা ব্যথা নেই। হয়তো অচেনা-অজানা কেউ, আমাদের শহরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। যমজ দুই ভাই বলেছিল এমিকে তারা ওই লোকটির সঙ্গে মোটরসাইকেলে দেখেছে। শুধু ওরাই দেখেছে।'

'আমিও দেখেছি তাকে।' শিউরে উঠে বলল মেবেলিন। 'কী ভয়ংকর শীতল নীল চোখ! সাপের মতো মুখ। ওই মুখ একবার দেখলে ভোলা যায় না।'

পাঁচ

ত্রিশ মাইল দূরে, ইস্ট-ওয়েস্ট হাইওয়ের মূল রাস্তায় একজন মোটরসাইকেল চালক অন্ধকারে তার বাইক চালিয়ে যাচ্ছিল। পরনে চামড়ার জ্যাকেট আর মাথায় চকচকে কালো হেলমেটে তাকে মনে হচ্ছিল প্রকাণ্ড এক শিকারী পোকা।

ঘন্টায় একশো কিলোমিটার বেগে সাঁ করে সে পাশ কাটাল একটি সাইনপোস্ট, ঢুকে পড়ল একটি আন্ডারপাসে, এ সরু রাস্তাটি চলে গেছে স্টিলওয়াটার শহরের দিকে।

অপর প্রান্ত থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এল বাঁধাকপি বোঝাই একটি ফার্ম লরি। অল্পের জন্য মোটরসাইকেল আর লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হল না। সশব্দে ব্রেক কষল লরিঅলা, জানালা দিয়ে মুখ বের করে ক্রমে অপসৃয়মান মোটর সাইকেল আরোহীর উদ্দেশ্যে ঘুষি নেড়ে দেখাল।

জবাবে মোটরবাইকঅলার জ্যাকেটের পেছনে কুণ্ডলি পাকিয়ে থাকা একটি সাপ তার চেরা জিভ লকলক করে বের করে যেন ভেংচি কাটল লরির ড্রাইভারকে। বাইক চালক ঠাট্টার ভঙ্গিতে একটি স্যালুট ঠুকল লরির চালককে। তারপর পেছনে প্রচুর ধোঁয়া ছড়িয়ে রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেল মানুষ এবং যন্ত্র উভয়ে।

শেষ চুমুক দিয়ে কফির মগটা কাউন্টারে রেখে দিল শেরিফ।

'যাকগে,' বলল সে। 'এখন আমি চলি। দেখি অ্যানির কোন খোঁজ পাই কিনা।' কফির দাম চুকিয়ে মেবেলিনের গালে আদর করে চাপড় দিল। 'যদি কিছু চোখে পড়ে, যে কোন কিছু, আমাকে ফোন কোরো, কেমন?'

'আচ্ছা,' ভাংতিটা শেরিফকে এগিয়ে দিল মেবেলিন। 'জনস্টনের বাচ্চটাকেও খুঁজতে বলছ তুমি?'

'হুঁ। যদি সন্ধান পাও সোজা বাড়ি যেতে বোলো। নইলে আমার কাছে ওকে জবাবদিহি করতে হবে।'

'মেয়েটা দেখতে কেমন?'

'অবিকল ওর মায়ের মত,' জবাব দিল জোনাস। সুইংডোর ঠেলে কুয়াশাঘেরা কার-পার্কে পা রাখল।

'মোটাসোটা এবং মুখে ফুটকির দাগ,' আপন মনে নিরাসক্ত গলায় বলল মেবেলিন। মেরী বেথ জনস্টনের মধ্যে যে কী পেয়েছে জোনাস বুঝতে পারে না সে। মহিলাকে নিশ্চয় খুব ভালবাসে ও। তাই পনেরো বছর পরেও ভুলতে পারেনি।

মেবেলিন যখন ভেবেছে ও একটা সুযোগ নেবে ঠিক তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীর কোথ্বেকে এসে জোনাসের মনে পুরানো প্রেমিকার সমস্ত স্মৃতি আবার জাগিয়ে তুলেছে।

সেই মোটরসাইকেলঅলার মত। সে-ও মেরী বেথ জনস্টনকে খুঁজছিল। বলেছিল সে নাকি বেথের পুরানো বন্ধু। বলেছিল সে বেথের আশেপাশেই কোথায় যেন থাকে।

জোনাসকে তখন এসব কথা বলেনি মেবেলিন। পুরানো স্মৃতিগুলো পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে চায়নি মনে। তার কি উচিত ছিল বলা? এমি উইলিয়ামসের অদৃশ্য হয়ে যাবার পেছনে বাইকঅলার কোন ভূমিকা ছিল?

এখন বলবে মেবেলিন? জোনাস তো চলে গেছে।

সে ডেক সিটে একটি দেশাত্মবোধক এবং ওয়েস্টার্ন সিডি ঢোকাল। বেজে উঠল 'স্ট্যান্ড বাই ইয়োর মেন' গানটি। খালি খাবার ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল সুর।

অ্যানি এবং এমি স্বচ্ছন্দ পায়ে হেঁটে চলেছে পেভমেন্ট দিয়ে, নানান প্রশ্ন করে জেনে নিচ্ছে একে অপরের সম্বন্ধে।

'তুমি আসলে এখানে কী করতে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল এমি।

'আমার মা আর তার নতুন স্বামীটি গেছে 'বিজনেস ট্রিপ'-এ। হা হা। আমাকে সঙ্গে নিতে চায়নি। তাই গ্র্যানির কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিল।'

'এখানে অনেকদিন থাকবে?'

'নাহ্। ছুটি শেষ হলেই স্কুলে ফিরব। আমি বোর্ডিংস্কুলে পড়ি। সৎবাবাই ভর্তি করে দিয়েছে।'

'ওকে তুমি তেমন পছন্দ করো না, না?'

'ও একটা শুয়োর। এমন আচরণ করে আমার সঙ্গে যেন আমি একটা অদৃশ্য মানব। মা'র ধারেকাছেই আমাকে ঘেঁষতে দেয় না। মেজাজ কেমন লাগে বলো?'

'তবে অবস্থা এর চেয়েও খারাপ হতে পারত।'

'তুমি তো তা বলবেই।'

'সত্যি বলছি,' অ্যানির কোমরে হাত রেখে ওকে এক পাক ঘুরিয়ে দিল এমি। 'সে কি তোমার গায়ে হাত তোলে?'

ভারসাম্য রক্ষা করল অ্যানি। 'অবশ্যই না। মার ভয়ে গায়ে হাত তুলতে পারে না।'

'তাহলে তো তুমি ভাগ্যবতী।'

এমি ট্যাঙ্গো ডান্সারের মত ওর গায়ে লাফিয়ে পড়ল। ভারসাম্য হারিয়ে দুটি মেয়েই পড়ে গেল মাটিতে। খিলখিল করে হাসল।

'দিস ইজ হোপলেস,' বলল অ্যানি। ছদ্মবেশ খুলতে খুলতে সিধে হল। 'খামোকা এসব পড়ে এলাম। না আসলেই ভালো হতো। ঘরে থাকতাম। আরামে থাকতাম।'

'এখন তো ইচ্ছা করলেই ফিরতে পারছ না,' হাসি হাসি মুখ নিয়ে বলল এমি।

'একটা কাজ করি এসো। চাদরগুলো গায়ে জড়িয়ে নিয়ে, মুখ ঢেকে শুধু চোখজোড়া বের করে রেখে লোককে ভয় দেখাবো।'

'চেষ্টা করে দেখা যায়।'

গা থেকে চাদর খুলল অ্যানি। হঠাৎ লক্ষ্য করল পাশে নেই এমি। ও নিজের সঙ্গে কথা বলছে। বোকা বনে গিয়ে চারপাশে তাকাতে লাগল।

'বুউউ!' একটা ঝোপের আড়াল থেকে লাফ মেরে বেরিয়ে এল এমি।

দারুণ ভড়কে গিয়েছিল অ্যানি, ভয়ও পেয়েছে। হাত বাড়িয়ে ধরতে গেল নতুন বান্ধবীকে, এমি নাচের ছন্দে হালকা পদক্ষেপে সরে গেল ওর নাগালের বাইরে।

'তুমি খুব অদ্ভুত টাইপের একটা মেয়ে, জানো?' বলল অ্যানি। 'মাঝে মাঝে ভাবি তুমি সত্যি আমার বন্ধু কিনা।'

'একথা কেন বলছ? অবশ্যই আমি তোমার বন্ধু।'

'তাহলে অমন করে ভয় দেখাও কেন? আত্মা উড়ে যায়।'

'মজা করছিলাম,' একটা হাত বাড়িয়ে দিল থাবার মত। 'ভূতেরা তো ভয়ই দেখাবে, তাই না?'

ছয়

'এই ছেলেরা,' পুলিশ কারের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ভ্যাম্পায়ারের সাজে সজ্জিত দুই যমজ ভাইকে চেপে ধরল শেরিফ। মিসেস জে'র নাতনীকে দেখেছ?'

'না, স্যার।' জবাব দিল একজন।

'আমরা ওকে ডাকতে গিয়েছিলাম,' ব্যাখ্যা দিল অপরজন। 'কিন্তু ওর নানী বললেন ওর নাকি সর্দি লেগেছে তাই বেরুতে পারবে না।'

'কিন্তু ও কিছুক্ষণ আগে বেরিয়েছে,' বলল জোনাস। 'আরেকটি মেয়ের সঙ্গে-মেয়েটি কে চিনি না। ওদেরকে দেখতে পেলে অ্যানিকে বলবে তার নানী তার চিন্তায় অস্থির। সে যেন এক্ষুণি বাসায় ফিরে যায়।'

সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল দুই যমজ।

'আর শোনো...'

'জ্বী, স্যার?'

'ওই মোটরসাইকেলঅলাকে যদি আবার চোখে পড়ে...' বাক্য অসমাপ্ত রেখে দিল জোনাস।

'আপনাকে অবশ্যই জানাবো।'

'ওর সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই, বুঝেছ? দেখতে পেলেই সোজা সবচেয়ে কাছের বাড়িতে গিয়ে থানায় একটি ফোন করে দেবে।'

'জ্বী, স্যার।'

'আর রাস্তায় যার সঙ্গেই দেখা হোক না কেন তাকে বলবে অ্যানিকে দেখা মাত্র যেন সে তাকে যতদ্রুত সম্ভব বাড়ি ফিরে যেতে বলে।'

'ওকে আমরা চিনব কী করে?' যমজ দুই ভাইয়ের একজন, জ্যাকি জিজ্ঞেস করল।

'কোন নতুন মেয়েকে দেখলেই বুঝবে ও অ্যানি। অন্য কোন শহরের মেয়ে নিশ্চয়ই এত রাতে বাইরে ঘুরঘুর করবে না।'

ওরা বলল চিনতে পারবে অ্যানিকে। ওদের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে ক্লাচ টিপে গাড়ি নিয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল শেরিফ।

তাকে যেতে দেখল যমজ ভাইয়েরা ঠোঁটে বিনয়ী, নম্র হাসি ফুটিয়ে। কিন্তু যে-ই গাড়িটি চলে গেল চোখের আড়ালে, ওদের মুখে ফুটল শয়তানী হাসি।

'এই অ্যানি মেয়েটা আজব তো!' মন্তব্য করল জ্যাকি।

'ও কি জানে না এ সময় রাস্তায় নামা মোটেই উচিত হয়নি ওর।' হাতে হাত ঘষল জো। 'দুষ্টু, দুষ্টু।'

'আবার ওর সঙ্গে আছে একজন।'

'আরেকটা মেয়ে,' হাসল জ্যাকি।

তারপর ওরা শিস দিতে দিতে হাঁটতে লাগল জনশূন্য রাস্তায়।

'চলো বুড়ো বুলিঙ্গারের বাড়ি যাই,' প্রস্তাব দিল এমি। 'ওখানে কেউ যাবে না।'

'কেন যাবে না?'

'কারণ উনি স্কুল প্রিন্সিপাল। খুব খিটখিটে মেজাজ।'

ভূতের পোশাক পরা একটি দলকে এগিয়ে আসতে দেখে অ্যানিকে নিয়ে চট করে একটি গলিতে ঢুকে পড়ল এমি।

'আমরা লুকাচ্ছি কেন?' রাগ হল অ্যানির।

'তুমি কি তোমার গ্র্যানির হাতে ধরা খেতে চাও?'

ডানে-বামে মাথা নাড়ল অ্যানি।

'তাহলে লোকে আমাদেরকে যত কম দেখবে ততোই ভালো। যদিও আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ লাগছে।'

'কী সন্দেহ?'

'মনে হচ্ছে কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে,' জবাব দিল এমি। কেমন হিমশীতল শোনাল ওর কণ্ঠ।

অ্যানির ঘাড়ের পেছনের চুলগুলো সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল।

'থামো তো,' বলল ও। 'তুমি আবার আমাকে ভয় দেখাচ্ছ।'

'কী ভীতু মেয়েকে বাবা!'

এমি অ্যানির কনুই খামচে ধরে একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ডোরবেল

টিপে দিয়ে পিছিয়ে গেল কয়েক কদম, অ্যানিকেও ওর পাশে এসে দাঁড়াতে বলল।

দোরগোড়ায় যে মানুষটি এসে দাঁড়ালেন তার বয়স ষাট ছুঁইছুঁই। ধূসর চুলগুলো পাতলা হয়ে মাথায় টাকের সৃষ্টি করেছে। গায়ে গলফ খেলার সুয়েটার।

'কে গো তোমরা?'

একটি ছোট কুকুর আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা, শুধু চোখদুটো বেরিয়ে আছে, ভৌতিক মূর্তি দুটোর দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে কেঁউ কেঁউ করতে করতে একলাফে হলওয়েতে সেঁধুলো।

'দেখুন তো চিনতে পারেন কীনা।' গলা মোটা করে জবাব দিল এমি।

'নাহ্, চিনতে পারছি না,' হাসলেন মি. বুলিঙ্গার। 'তো তোমাদের মতলব কী? ট্রিক নাকি ট্রিট?'

'আমার বান্ধবী আপনাকে একটি কবিতা শোনাবে,' বলে অ্যানিকে সামনের দিকে ঠেলে দিল এমি। অপ্রস্তুত অ্যানির তাৎক্ষণিকভাবে 'টুইংকল টুইংকল লিটল স্টার' ছড়ার কথা মনে পড়ল। ওটাই শোনাল সে।

'চমৎকার,' ছড়া শুনে হাততালি দিলেন মি. বুলিঙ্গার। 'তো মেয়েরা, তোমরা কি এখন ভেতরে এসে দু'কাপড় আপেল খাবে?'

'নাহ্, এখন কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না,' অ্যানি কিছু বলার আগেই আমন্ত্রণ ফিরিয়ে দিল এমি। 'আমরা এখন যাবো। মা রাত দশটার মধ্যে বাসায় ফিরতে বলেছেন।'

হতাশ হলেও কণ্ঠে ভাবটা ফুটতে দিলেন না মি. বুলিঙ্গার। 'তাহলে একটু দাঁড়াও। তোমাদের জন্য কিছু মিষ্টি নিয়ে আসি।'

কিন্তু ওরা মিষ্টি খেতেও রাজি হলো না। মি. বুলিঙ্গার এদেরকে দুটো ব্যাগ বোঝাই কিছু উপহার দিলেন। ওরা রাস্তায় নেমে এল।

'মিষ্টি খাওয়া আমার মানা।' জানাল এমি।

'কেন?' প্রশ্ন করল অ্যানি।

'দাঁতের জন্য,' বলল এমি। যেন এতেই সব ব্যাখ্যা করা হয়ে গেছে।

'বিদায় মেয়েরা,' পেছন থেকে সস্নেহে বললেন মি. বুলিঙ্গার।

'বুড়ো শয়তান,' মন্তব্য করল এমি।

'আমার কিন্তু লোকটাকে মন্দ লাগেনি।'

'তোমার ভাগ্য ভালো যে আমি তোমার সঙ্গে আছি,' বলল এমি। 'তোমার মা কি কখনো সাবধান করে দেননি যে অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে নেই? ওই লোকটা একা একা থাকে। বিয়ে করেনি। বাকিটা বুঝে নাও।'

'ভয়ানক দুই যমজ,' বিড়বিড় করল অ্যানি। 'রহস্যময় স্কুল শিক্ষক। ছোট্ট একটা শহরে আরও কত কী অদ্ভূত মানুষ দেখব।'

'এ শহরের হাল হকিকত তো কিছুই জানো না তুমি,' বলল এমি। একটা

পুলিশের গাড়ি আসতে দেখে অ্যানিকে নিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল ও।

ধীরে ধীরে ভরে গেল রাস্তাঘাট ভূত-প্রেত-পিশাচ, পরী, ক্লাউন, কংকাল, যোদ্ধা আর রোবটদের ভিড়ে। অ্যানির গ্র্যানি জানালা দিয়ে হ্যালোউইনের সাজে সজ্জিত এই অদ্ভুত ছেলেমেয়েগুলোকে দেখছিলেন। উদ্বেগ গোপন করার চেষ্টা করছেন তিনি।

'ও কোথায় যেতে পারে, নাথান?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'আমরা কি বাইরে গিয়ে একবার খুঁজব?'

'ধরো, আমরা বাইরে গেলাম আর তখন এসে হাজির হলো অ্যানি, দরজা বন্ধ থাকবে বলে ও তো ভেতরেই ঢুকতে পারবে না।'

'কিন্তু ও ওভাবে কাউকে কিছু না বলে চলে গেল কেন? কীসে ভর করেছিল অ্যানিকে?'

'হ্যালোউইন ডে তো, বোধহয় ভূতে ভর করেছিল।'

'ইয়ার্কি মেরো না। ওর যদি কিছু হয়ে যায় নিজেকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারব না আমি। ওর মাকে কী বলব আমি?'

নাথান নানীকে কিচেনে, একটি চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে হাতে এক গ্লাস দুধ ধরিয়ে দিল।

'আমি জানি তুমি কী ভাবছো,' বলল সে। 'কিন্তু যা ভাবছ তা ভুল। এমি উইলিয়ামস বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সে হারিয়ে গেছে। ঘটনাটা দুঃখজনক, কিন্তু এরকম তো আর কখনো ঘটেনি। চিন্তা কোরো না। অ্যানির যখন মনে হবে তুমি ওর জন্য চিন্তা করছ তখন সে ঠিকই ফিরে আসবে।'

'কিন্তু আমি ওকে দেখেছি, নাথান। আমি এমিকে পরিস্কার দেখেছি। এর ব্যাখ্যা কী দেবে তুমি?'

মাথা নাড়ল নাথান।

'হয়তো ওটা আলোর কারসাজি ছিল,' বলল সে। 'অথবা তোমার চশমার পাওয়ার আবার বদলানোর সময় হয়ে এসেছে।'

সাত

বিলি উইলিয়ামস তার ডজ গাড়িটি নিয়ে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে বাড়ি খেল রট-আয়রন পোস্টের সঙ্গে, তুবড়ে গেল একটা উইং।

গাড়ি থেকে হুইস্কির আর সস্তা পারফিউমের গন্ধ আসছে। কেসি টের পাবার আগেই গন্ধটা দূর করা দরকার। বিলি জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল। শরতের শীতল হাওয়ায় কেঁপে উঠল। সামনে ঝুঁকল সে, ব্যথায় দপদপ করছে মাথা, স্টিয়ারিং হুইলের ওপর মাথা রাখল।

গত দুদিন ধরে অবিরাম মদ্য পান করে চলেছে বিলি। মাতাল না হয়ে বাড়ি ফিরতে পারে না ও। লোকে বলে ওর কোন আবেগ-অনুভূতি নেই। কিন্তু ও-ও তো একটা মানুষ।

ওর সুখের সময়ের অংশটুকু ফুরিয়ে গেছে দ্রুত, সবাইকে মদ কিনে দিয়ে বাহবা কুড়িয়েছে। তারপরের সময়টাতে সে তার দুঃখ ভুলতে গিয়ে মদ খেতে খেতে ছোট্ট বেচারী এমির কথা ভেবে ফুঁপিয়েছে। আর এখন তাকে পার করতে হবে বিপজ্জনক সময়টুকু।

ঝগড়া করার জন্য তৈরী হয়েই এসেছে বিলি।

তবে এর মধ্যে ব্যক্তিগত কোন বিষয় নেই। অন্য যে কেউ হলে একই কাজ করত।

হুইল থেকে মাথা তুলল বিলি, রিয়ার ভিউ মিররে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে দাঁত-মুখ খিঁচাল, ওপরের ঠোঁটে লেগে থাকা স্প্যাগেটি সস মুছল হাতের তালু দিয়ে। তারপর নেমে এল গাড়ি থেকে। সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে এগোল তার শোকার্ত স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্য।

সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল বিলি, কোঁচকানো, দোমড়ানো জ্যাকেটের পকেট হাতড়াচ্ছে চাবির জন্য, পাচ্ছে না বলে গালাগাল করছে। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের ওজন পুরোটা চাপিয়ে দিল ডোরবেলের ওপর, কেসি এসে দরজা না খোলা পর্যন্ত বেল বাজিয়েই চলল।

'এসব আমি আর বইতে পারব না,' বলল অ্যানি। একহাত দিয়ে ধরে আছে বিছানার চাদর, অন্যহাতে দিয়ে চেষ্টা করছে যাতে বিস্কিট পড়ে না যায়। ওর অপর হাতে বিস্কিট, ব্র্যান্ডিসহ নানান হাবিজাবি জিনিস। 'আমাদের একটা ব্যাগ নিয়ে আসা উচিত ছিল।'

গত আধঘন্টা ধরে ওরা ট্রিক অর ট্রিটের বদলে লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে থাকার কাজেই বেশি ব্যস্ত ছিল। আর যতবারই অ্যানির মনে পড়েছে এখন হোক বা কিছুক্ষণ পরে হোক, বাসায় তাকে ফিরতেই হবে এবং গ্র্যানির বকা অনিবার্য, বুক শুকিয়ে এসেছে। ওরা তিনটে বাসায় ঢুঁ মেরেছিল। দুজনেই প্রচুর পরিমাণে হ্যালোউইনের উপহার পেয়েছে।

'আমি ঘরে ঢুকব কী করে বলোতো?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি। যেখান থেকে রওনা হয়েছিল ওরা, হাঁটতে হাঁটতে সেখানে অর্থাৎ এমির বাড়ির বিপরীত দিকে চলে এসেছে। রাস্তার ওপার থেকে ভেসে এল হাসির আওয়াজ, ঘন কুয়াশার কারণে উৎসটা দেখা গেল না। এমিদের বাসা থেকে অ্যানিদের বাড়ি খানিকটা দূরে, মার্থা জনস্টনের বাড়িটি ঝলমল করছে আলোয়। রাস্তার ওপাশে, ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িতে আছে একটি কালো গাড়ি, প্যান্থারের মত অশুভ চেহারা, যেন অসতর্ক কাউকে পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর।

'সেরেছে।' বলল এমি। 'আমার বাবা এসেছে।'

'এসেছে ভালো হয়েছে,' যেন আশার খড়কুটো চেপে ধরল অ্যানি। 'তোমার বাসায় কিছুক্ষণ বসা যায় না? গ্র্যানি পার্টি দিচ্ছে। লোকজন আসার পরে আমি যদি হাজির হউ, অতিথিদের সামনে তিনি হয়তো চিল্লাচিল্লি করবেন না। আর ওরা চলে যাবার পরে,' উৎফুল্ল গলায় যোগ করল সে, 'গ্র্যানি হয়তো পুরো ব্যাপারটা ভুলে যাবেন।'

'হতেও পারে,' বলল এমি। 'আমার ঘরটা বাড়ির পেছন দিকে। বাবা এসে পড়েছে, এখন আর আমি ভেতরে ঢুকতে পারব না।'

'আমার তাহলে বারোটা বেজে গেল।'

খিকখিক হেসে উঠল এমি। অদ্ভুত এবং খনখনে শোনাল সেই হাসি।

'তোমার-আমার দুজনেরই বারোটা বেজে গেছে,' বলল সে। অ্যানির চেহারায় হতাশা ফুটে উঠতে দেখে প্রস্তাব দিল, 'চলো, বাগানে গিয়ে বসি। বাগানে একটা দোলনা আছে, বাড়ির জানালা থেকে অনেক দূরে। ওখানে বসলে কেউ আমাদেরকে দেখতে পাবে না। মিনিট ত্রিশ বসবো। ততক্ষণে তোমার গ্র্যানির বাসার অতিথিরা চলে আসবেন আর আমার বাবাও ঘুমিয়ে পড়বে। ভাগ্য ভালো থাকলে আমরা দুজন যে যার বাড়িতে চুপিচুপি ঢুকে পড়তে পারব।'

'মন্দ বলনি।'

এমি সামনে, ওরা দুজন রাস্তা দিয়ে দ্রুত এগোলো। স্ট্রিট ল্যাম্পের আলোর বন্যা এড়াতে ওরা বাগানের ভাঙা বেড়ার সামনে পেট দিয়ে শুয়ে পড়ল। তারপর এগুলো হামাগুড়ি দিয়ে। গেটপোস্ট পার হয়ে ঢুকে পড়ল ড্রাইভওয়েতে। ডজ গাড়িটি ক্যামোফ্লেজ হিসেবে ব্যবহার করে ওরা বাড়িটির পাশে চলে এল। দেয়াল ধরে ধরে, কুঁজো হয়ে, পা টিপেটিপে চলে এল বাগানের নিরাপদ অংশে। তারপর এক ছুটে উঠে পড়ল জীর্ণ দোলনায়। 'এসব চাদর ফাদর ফেলোতো,' অ্যানি গা থেকে চাদর খুলে কুণ্ডুলি পাকিয়ে পেছনে রেখে দিল। এমি চাদরটা চার ভাঁজ করে তার ওপর বসল। তারপর হাতের অন্যান্য জিনিসগুলো দোলনায়, দুজনের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটিতে রাখল।

'সাড়ে বারোখানা বিস্কিট, চারটে টফি আপেল, পনেরোটি চকোলেট বার, কিছু মিঠাই আর দু'টি যস্টি মধু।' জিনিসগুলো ভাগ করতে শুরু করল অ্যানি। 'একটা তোমার, একটা আমার...'

'তোমাকে বললাম না সবগুলো তুমি নিয়ে যাও,' বলল এমি। 'আমি মিষ্টি খাই না।'

'অ্যাই শোনো,' হঠাৎ একটা মতলব এসেছে অ্যানির মাথায়। 'আমার সঙ্গে পার্টিতে যাবে, চলো। একজন বন্ধু নিয়ে ঘরে গেলে গ্র্যানি নিশ্চয়ই আমার ওপর চড়াও হবেন না।'

'পারব না।'

'কেন পারবে না? বাসায় কুমড়োর পাই আছে। তুমি না কুমড়োর পাই খাওয়ার জন্য জীবন দিতে পারো?'

'যেতে পারব না, ব্যস।'

'পারবে না নাকি যেতে চাইছ না?'

'বকবক একটু থামাও বাপু,' কর্কশ সুরে বলল এমি। 'আমি আরেকটা বিষয় নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় আছি।'

মুখ তুলে চাইল অ্যানি। এমি সম্মোহিত কাঠবেড়ালির মত তাকিয়ে আছে ওদের বাসার আলোকিত জানালায়। কাঁচের পেছনে, সিনেমার মত সংঘটিত হতে চলেছে একটি নাটক। স্টেশন থেকে ফেরার পথে উল-কাঁটা হাতে যে মহিলাকে দেখেছিল অ্যানি, সে-ই মহিলা এখন বিশালদেহী, নোংরা বসনের, পাতলা চুলের, মুষ্টিযোদ্ধাদের মত হাতের এক লোকের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে ব্যস্ত।

'ওরা কি তোমার বাবা-মা? কী নিয়ে ঝগড়া করছেন ওরা?'

'বোধহয় আমাকে নিয়ে,' জবাব দিল এমি। 'বাবা যখনই মাতাল হয়, আমাকে নিয়ে ঝগড়া করে। বাবা যখন বাসায় আসে আমি তার ধারে-কাছেও যাই না। বাবা খুব মারে।'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণ করতেই যেন জানালার সামনে দাঁড়ানো ষাঁড়ের মত লোকটা তার হাতের তালু দিয়ে প্রচণ্ড থাবড়া বসিয়ে দিল ফ্যাকাশে চেহারার মহিলার নাকে। পটকা ফাটার আওয়াজ হল।

অ্যানি টের পেল ওর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে, পেট উগলে বমি আসছে। ডন অন্ততঃ গায়ে হাত তোলে না, ভাবছে ও। হয়তো ও অতটা খারাপ লোক নয়। অ্যানি যদি তার সঙ্গে আরেকটু ভাল ব্যবহার করত তাহলে হয়তো...

মহিলার নাক দিয়ে দরদরিয়ে রক্ত পড়ছে। লোকটা ঘুরল, টলতে টলতে অদৃশ্য হয়ে গেল দৃশ্যপট থেকে। নিঃশব্দে কাঁদতে শুরু করেছে এমি। অ্যানি ওর গায়ে হাত রাখল সান্ত্বনার ভঙ্গিতে।

'তুমি এসব সহ্য করো কী করে?' বলল সে। 'আমি হলে বাড়ি ছেড়ে পালাতাম।'

'আমি পালাবার চেষ্টা করেছিলাম। তবে কাজ হয়নি।'

'ধরা পড়ে গিয়েছিলে?'

'মনে নেই,' তবে এমি যে সত্য কথা বলছে না ওর গলার স্বরেই বোঝা যায়।

'মনে নেই কথার মানে কী?'

'মনে করার চেষ্টা করলেও কিছু মনে পড়ে না।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না,' বলতে ইচ্ছা করল না অ্যানির। বদলে প্রশ্ন করল, 'তাহলে কাজ হয়নি বললে কেন?'

'সেরকমই মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল খারাপ কিছু ঘটেছে।' কুঁজো হয়ে গেল এমি, ওর ব্যথাতুর, ছোট্ট মুখে চোখজোড়া পিরিচের মত দেখাচ্ছে। 'আমি মনে

করতেও চাই না,' শিউরে উঠল, দাঁতে দাঁত লেগে ঠকঠক শব্দ হচ্ছে। 'আমার ভয় লাগছে।'

'ভয় কীসের,' বলল অ্যানি। 'আমি তো আছি।'

তির্যক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল এমি, কেমন অদ্ভূত চাউনি, লাজুক লাজুক আবার একই সঙ্গে ধূর্ত দৃষ্টি।

'তুমি আমার হয়ে মনে করতে পারবে?' বলল সে।

'মানে?' এমির কথাবার্তার ধরণ ঠিক পছন্দ হচ্ছে না অ্যানির।

'একটা খেলা খেলবে?' ওর হাতটা সরিয়ে দিল এমি।

'কী খেলা?'

'বিশেষ রকমের খেলা,' আড়চোখে অ্যানির দিকে তাকাল এমি। নানুর বাসায় বসে অ্যানি যখন কিছুক্ষণের জন্য পরাবাস্তবতার জগতে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসেছিল, ওই সময় ঠিক এরকম ধূর্ত, চতুর চাউনি ফুটে উঠেছিল এমির মুখে। 'এ খেলার নাম 'আমি কি ভিতরে আসতে পারি'?'

অ্যানি জানালায় চোখ ফেরাল। এমির মা মাথা কাত করে বসে আছে, রক্তঝরা নাকে ধরে রেখেছে রুমাল।

'আমাদের ভেতরে যাওয়া উচিত না?' বলল অ্যানি।

'কী জন্য?' বলল এমি। 'যাতে সে আমাকেও ধরে পেটাতে পারে? সে দোতলায় যাবে ঘুমাতে। দশ মিনিট যাক। তারপর আর কোন সমস্যা নেই।'

অ্যানির থুতনি ধরে মুখখানা নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিল এমি। ওর হাত হিম ঠাণ্ডা।

'তুমি খেলাটা খেলবে নাকি খেলবে না?' জিজ্ঞেস করল এমি।

অ্যানির এখন বাসায় ফিরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু বন্ধু তো বন্ধুই, তার অনুরোধ ফেলা যায় না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হল সে।

'ঠিক আছে।' বলল অ্যানি। 'এতে যদি তোমার মন ভালো হয়ে যায় তো খেলব আমি। আমরা কী করব?'

'চোখ বন্ধ করো,' বলল এমি। অ্যানি চোখ বুজল। এমির কণ্ঠ যেন ভেসে এলো অনেক দূর থেকে।

'তোমার মনের ভেতর থেকে সবকিছু দূর করে দাও। মাথাটা খালি করার চেষ্টা করো। একদমই কোনকিছু নিয়ে ভাববে না।'

অ্যানি কোন কিছু নিয়ে না ভাবার চেষ্টা করে দেখল কাজটা বড্ড কঠিন। অদ্ভুত সব দৃশ্য এসে ভিড় করছে মস্তিষ্কে। মাকে দেখছে সে। তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। একটা গ্রে হাউন্ড বাসের ভেতরটা দেখছে অ্যানি। হাজির হয়েছে রাস্তার একটা বেড়াল, একবার সাগরে বেড়াতে গিয়ে ওটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল ওর।

ধূসর রঙের ওপর মনোযোগ দেয়ার চেষ্টা করল অ্যানি। ক্লান্তির রঙ ধূসর। ধূসর মেঘ, ধূসর দেয়াল, ধূসর শূন্যতা।

হঠাৎ মনে হল ওর শরীরের ওজন কমে গেছে, ও কাত হয়ে গেছে একদিকে, যেন শরীর গিয়ার বদলাচ্ছে। ও আর বাগানে নেই। একটা ঘরের মধ্যে চলে এসেছে। কিন্তু ঘরটিকে চিনতে পারছে না অ্যানি। এ কামরাটি তার পছন্দ নয়। দেয়ালে পপ-স্টারদের ছবি ছাড়া অন্য কিছু নেই। রংজ্বলা ওয়ারড্রোব, কাঠের তৈরী দেরাজঅলা একটা আলমারী, সরু, অগোছালো বিছানা, সবগুলো নিস্প্রভ বাদামী রঙের, ডেস্কটিও তাই। ওতে বসে একটি বাদামী ফোল্ডারে লিখছে নীল রঙের কলম দিয়ে। কিন্তু হাতজোড়া যেন ওর নয়। হাতের লেখাটাও। তার মাথায় একটা হেডসেট তবে মিউজিক ছাপিয়ে তার কানে ভেসে আসছে বাইরের হলওয়ের চেঁচামেচি।

অকস্মাৎ খুলে গেল দরজা। অ্যানি সেই লোকটাকে দেখতে পেল যাকে সে বসার ঘরে দেখেছিল। দেখল লোকটার সঙ্গে তার কথা কাটাকাটি হচ্ছে। বাঘের মত লাফ মেরে এগিয়ে এল সে, অ্যানি ভয়ে কুঁকড়ে গেল, তার একটা হাত উঠে এল মুখের ওপর ঘুষি ঠেকাতে।

কিন্তু লোকটা তাকে ঘুষি মারল না, শক্ত মুঠোতে কাঁধ চেপে ধরে চেঁচাতে লাগল, 'তোকে মজা দেখাচ্ছি!'

লোকটার মুখ থেকে ছিটকে আসছে থুতু। কোটর ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, মুখ দিয়ে ভক ভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে।

তারপর অ্যানির মাথার মধ্যে বিস্ফোরণের মত কী যেন ঘটে গেল, দেখল ও আর ঘরে নেই, ফিরে এসেছে বাগানে, বসে আছে দোলনায়।

তবে এখন ও একা। এমি চলে গেছে। শুধু আছে সেই লোকটা, প্রচণ্ড জোরে চেপে ধরে রেখেছে ওর কাঁধ, তারস্বরে চেঁচাচ্ছে।

'আমার বাগানে ঢুকে গোয়েন্দগিরি করার কোন অধিকার তোমার নেই। এখানে কী করছ? অন্য লোকের বাড়িতে বাড়িতে চোরের মতো ঢোকার মজা আমি তোমাকে হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দেব।'

লোকটা হাত তুলল ওকে মারার জন্য।

অ্যানি উদ্ভ্রান্তের মত তাকাল আশেপাশে।

'এমি,' চিৎকার দিল ও। 'আমাকে বাঁচাও।'

বরফের মত জমে গেল লোকটা।

লোকটার পেছনের জানালা খুলে যাওয়ার শব্দ শুনল অ্যানি, ভেসে এল এক মহিলার গলা।

'বিলি, করছটা কী? বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও। নইলে কিন্তু আমি শেরিফকে ফোন করব। ওকে ছাড়ো, বিলি। আমি মিথ্যা হুমকি দিচ্ছি না।'

ঘোঁতঘোঁত করতে করতে অ্যানিকে ছেড়ে দিয়ে টলতে টলতে দু'কদম পিছিয়ে গেল লোকটা।

আর ছাড়া পেয়ে ছুট দিল অ্যানি।

আট

অ্যানি ছুটল, এমির বাবার পাশ কাটিয়ে এক ছুটে চলে এল রাস্তায়, ভুলে গেল চাদর আর বিস্কিটের কথা, ভুলে গেল দিগ্বিদিক, শুধু মনে একটাই চিন্তা যত দ্রুত সম্ভব বিলি উইলিয়ামসের কাছ থেকে পালাতে হবে।

জান বাজি রেখে দৌড়াচ্ছে অ্যানি, ছুটতে ছুটতে প্রচণ্ড হাঁপ ধরে গেল, দমের অভাবে বুক জ্বলছে আগুনের মত। অবশেষে ক্ষান্ত দিল ও, একটা গাছে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগল, শরীর ভাঁজ হয়ে মুখ হাঁ করে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ওর পা যেন নরম কাদা। শরীরের ওজন আর বইতে পারছে না। বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে বলতে। চারপাশে তাকাল ও, কোথায় চলে এসেছে বোঝার চেষ্টা করছে। সবকিছু অচেনা ঠেকছে। ও রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনতে পেল অ্যানি, রাস্তার মাথা থেকে আসছে, একটা শরীর দেখতে পেল ও ক্ষণিকের জন্য। একটা ল্যাম্পপোস্টের আড়াল থেকে সাঁৎ করে বেরিয়ে পাশের একটি গাছের ছায়ায় চলে গেল।

'কে ওখানে?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল অ্যানি।

জবাব দিল না কেউ।

দীর্ঘস্থায়ী হলো নীরবতা, অ্যানির স্নায়ুতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। ও সবে ভাবতে শুরু করেছে যা দেখছে ভুল দেখছে ঠিক তখন ঢিলা একটা আলখেল্লা পরা একটি মূর্তি এসে দাঁড়াল রাস্তায়।

নিঃশ্বাস আটকে গেল অ্যানির।

ড্রাকুলা!

ঘুরল অ্যানি, দৌড় দেবে, প্রস্তর মূর্তি হয়ে থেমে গেল দেখে রাস্তার অপর মাথায় দাঁড়ায়ে আছে ড্রাকুলার আরেকটি প্রতিমূর্তি। ওকে ওরা ঘিরে ফেলেছে। তবে এবারে ভয় পাওয়ার বদলে স্বস্তি বোধ করল অ্যানি। ওকে আসলে কোন ভ্যাম্পায়ার ধাওয়া করেনি। ওরা সেই মহা পাজী যমজ ভাই।

দাঁড়াও, দাঁড়াও। কী যেন ভাবছিল ও? এমির অপার্থিব কণ্ঠ ওর মাথায় ভেসে বেড়াচ্ছে। *ওদের ধারেকাছেও যেন যেয়ো না। ওরা খুব খারাপ।*

নড়ে উঠল দুই ড্রাকুলা, মন্থরগতিতে এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে।

ওদেরকে এগিয়ে আসতে দেখে বিদ্যুৎ খেলে গেল অ্যানির শরীরে। সে হাতের ধারের বাগানটির রাস্তা ধরে দৌড় দিল। একটা বাড়ি চোখে পড়ল ওর। ওই বাড়ির দরজায় দমাদম কিল মারতে লাগল, সে সঙ্গে চিৎকার করছে দরজা খুলে দিয়ে ওকে ভেতরে ঢুকতে দেয়ার জন্য।

অ্যানির বরাত মন্দ যে বাড়িতে ও ঢুকতে চাইছিল সেটা ডা. ব্রাউনের বাসা। তিনি

মাত্র দশ মিনিট আগে দরজা-টরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেছেন। গেছেন অ্যানির গ্র্যানির পার্টিতে।

যখন বুঝতে পারল অ্যানি কেউ তার কাতর আর্তিতে কান দেবে না, সে বাড়ির কিনার ঘেঁষে এগোল। এদিকে অনেকগুলো কার্ডবোর্ডের বাক্স পড়ে আছে। বাক্স সরিয়ে অন্ধের মত হাতড়ে পেছনের বাগানে চলে এল ও। বাগানটিকে বিভক্ত করে রেখেছে একটি বেড়া। বেড়ার ওপাশে আরেকটি বাগান, তারপর আরও একটি।

যমজ ভাইরা ওর পেছন পেছন দৌড়ে আসছে টের পেল অ্যানি। ওদের নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ভয়ে ওর পায়ে যেন পাখা গজাল। সে বাগান ধরে ছুট দিল। কুমড়োর ফ্লাওয়ার-বেড মাড়িয়ে ও ছুটছে। অবশেষে একটা ঝোপ পেরুতে রাস্তায় এসে পড়ল অ্যানি এবং দৌড়ে রাস্তা পার হতে গিয়ে আরেকটু হলেই এক মোটরসাইকেল চালকের নিচে বাহনের নিচে চাপা পড়তে যাচ্ছিল।

সশব্দে ব্রেক কষল চালক। শীতল নীল চোখে দেখল ছুটে যাওয়া অ্যানিকে।

অ্যানির পিছু নিয়ে আসছিল দুই যমজ, মোটর সাইকেলঅলার চোখে পড়ার আগেই ওরা তাকে দেখে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটার গতি হ্রাস পেল দুই ভাইয়ের, প্রথমে জগিং-এর মত করে দৌড়াতে লাগল, তারপর হাঁটতে শুরু করল। যেন দুই নিষ্পাপ ভ্যাম্পায়ার ঘুরতে বেরিয়েছে, নিজেদেরকে ছাড়া দুনিয়াদারীর অন্য কিছু চেনে না।

বাইক চালক তাদের দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মোটরসাইকেল নিয়ে ফিরে চলল খাবারের দোকানটিতে।

অ্যানি এদিকে ছুটতে ছুটতে ম্যাকডোনাল্ডের পাশের গলিতে ঢুকে পড়েছে, আবর্জনা রাখার একটা ড্রামের আড়ালে গুটিসুটি মেরে বসল। ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করা দরকার। মূল রাস্তায় এমির বাবা ওর ওপর হামলা না-ও চালাতে পারে। তবু কোন ঝুঁকি নিতে চায় না অ্যানি। পকেটে পয়সা থাকলে কোন রেস্টুরেন্টে ঢুকে গ্র্যান্ডমাকে ফোন করে বলত নাথান যেন ওকে এসে নিয়ে যায়। কিন্তু ওর কাছে কোন টাকা নেই। তাছাড়া ওর জামাকাপড় ছিঁড়ে গেছে, গায়ে ময়লা লেগেছে, এমন চেহারা নিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলে লোকে কী বলবে? ওকে হয়তো ঢুকতেই দেবে না। করণীয় একটাই, থানায় যাওয়া। আর এ কাজটাই করতে ইচ্ছে করছে না ওর। কারণ থানায় গিয়ে যদি বলে ও হারিয়ে গেছে, খুবই হাসির শোনাবে কথাটা। কিন্তু এছাড়া তো উপায়ও নেই। তাহলে পুলিশ ওকে নিরাপদে পৌঁছে দেবে বাড়ি। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল অ্যানি।

ও সিধে হলো, বেরিয়ে এল গলি থেকে।

এবং সোজা গিয়ে পড়ল ড্রাকুলা ভ্রাতৃদ্বয়ের কবলে।

ঘড়ি দেখল শেরিফ। প্রায় দশটা বাজে। আর ঘন্টা কয়েক বাদে সে মেবেলিনের সঙ্গে ড্রিংক করবে। সত্যিকারের মদ্য পান। কফি খেতে খেতে জিভ তেতো হয়ে গেল।

পেটে হাত বুলাল সে। হজমেও কেমন গোলমাল হয়েছে।

আর কয়েক ঘন্টা পর সে রিল্যাক্সড হবে, আগামী আরেকটা বছরের জন্য নিশ্চিন্ত। এ মুহূর্তে সে ভাবছে সবকিছু ঠিকঠাক আছে এমন সময় কিনা বাইকঅলা উদয় হলো!

মেবেলিন তাকে ফোন করেছিল। বলেছে ঘন্টাখানেক আগে সে নাকি বাইকঅলাকে দেখেছে। কিন্তু গত এক ঘন্টায় কোন মোটরসাইকেল আরোহীকে চোখে পড়েনি শেরিফের। গেল কোথায় লোকটা? এভাবে স্রেফ গায়েব হয়ে যেতে পারে না নিশ্চয়। নাকি সত্যি অদৃশ্য হয়ে গেছে? আর অ্যানিই বা কোথায়?

শেরিফ কোনভাবেই চায় না সেই ভয়ংকর রাতের পুনরাবৃত্তি হোক। তার গালের শুকনো ক্ষতটা চুলকাতে শুরু করল। কাটা জায়গাটা সে খচমচ করে চুলকাতে শুরু করল।

গলির পেছনে তাকাল অ্যানি। পালাবার রাস্তা খুঁজছে। নেই। এটা একটা কানাগলি। ফাঁদে পড়েছে ও।

শয়তানের চেহারা নিয়ে দুই যমজ ভাই ঘিরে ফেলল অ্যানিকে, ওকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল অন্ধকারের দিকে।

'তোমার গ্র্যানি জানেন যে তুমি রাস্তায় বেরিয়েছো?' জিজ্ঞেস করল এক নম্বর ড্রাকুলা, ভৌতিক হেসে সূচালো দাঁত দেখিয়ে দিল।

'তাতে তোমার কী?' বলল অ্যানি।

'ঝগড়া কোরো না,' বলল ড্রাকুলা দুই। 'আমরা শুধু বন্ধু হতে চাইছি।'

'এসো পরিচিত হই,' বলল ড্রাকুলা এক। 'আমি জো,' আলখাল্লাটির একটি আস্তিন নাটকীয় ভঙ্গিতে বুকের ওপর ঘুরিয়ে এনে কুর্নিশ করল।

'আর আমি জ্যাকি,' বলল নাম্বার দুই, থাবা মারল অ্যানিকে লক্ষ্য করে।

চট করে একপাশে সরে গেল অ্যানি।

'আমাকে তোমরা ছোঁবে না,' বলল ও। 'শুনেছি তোমরা মানুষ ভালো নও।'

'বদনামটা কে করল শুনি?' শক্ত হাত দিয়ে অ্যানির গায়ে একটা খোঁচা মারল জো।

আবর্জনার ক্যানটির সঙ্গে বাড়ি খেল অ্যানি। কিছুক্ষণ আগে এখানেই লুকিয়ে ছিল সে। একটা হাত শরীরের পেছনে নিয়ে গেল, ক্যানের ঢাকনার নিচে অস্ত্র জাতীয় কিছু খুঁজছে। ধারাল কোণাসহ কোন পাত্র। ভাঙা কোন বোতল। এরকম কিছু একটা পেলেই হলো। তাহলে ওটা দিয়ে ওদেরকে ভয় দেখিয়ে পালাতে পারবে অ্যানি। কিন্তু হাতে কিছুই ঠেকল না।

'এমি উইলিয়ামস বলেছে,' বলল অ্যানি। চোখের কোণা দিয়ে জ্যাকির বাম পায়ের কাছে একটা আধলা ইট চোখে পড়ল।

পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করল যমজ ভাইয়েরা, তারপর তাকাল অ্যানির দিকে। ওদের চাউনির ধরণ মোটেই পছন্দ হলো না ওর।

'কবে একথা বলেছে?' জিজ্ঞেস করল জো।

'কিছুক্ষণ আগে।'

'মিথ্যুক!' এক কদম সামনে বাড়ল জ্যাকি, এমন জোরে চেপে ধরল অ্যানির কব্জি, রীতিমত ব্যথা পেল মেয়েটা।

'ছাড়ো আমাকে,' গুঙিয়ে উঠল ও। 'লাগছে!'

'মিথ্যুক,' পুনরাবৃত্তি করল জ্যাকি, হাতটা মুচড়ে অ্যানির পিঠের কাছে নিয়ে এল।

'ছাড়ো বলছি,' ধস্তাধস্তি করছে অ্যানি। 'না ছাড়লে আমি কিন্তু চেঁচাব। তখন তোমদের কপালে ভোগান্তি আছে।'

কফিন-সাদা মুখটা অ্যানির মুখের কাছে নিয়ে এল জো। ওর নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ।

'মিথ্যাবাদী, মিথ্যাবাদী তুই কভু ছাড়া না পাবি,' সুর করে বলল সে।

'আমি মিথ্যা বলছি না,' বলল অ্যানি। 'ও বলেছে তোমরা খুব খারাপ। বলেছে তোমরা বড়দেরকেও নাকি মানো না। তাদেরকেও বোকা বানাও। ও ঠিকই বলেছে। তোমরা খুবই পাজী।'

'আমাদেরকে বোকা ভেবেছ, না?' দাঁতমুখ খিঁচাল জ্যাকি। 'মিথ্যাবাদী মোটি কোথাকার!'

'খবরদার আমাকে মিথ্যাবাদী মোটি বলবে না।'

'একশোবার বলব। কারণ এমি উইলিয়ামস এখানে আর থাকে না।' বলল জো।

'গত বছর এ সময় ও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল,' বলল তার ভাই।

'নিখোঁজ।' বলল জো।

'সবার ধারণা সে মারা গেছে,' হিসিয়ে উঠল জ্যাকি।

নয়

'আমার আর কিছু ভাল্লাগছে না,' হাত ছুঁড়তে ছুঁড়তে কিচেনে ঢুকলেন মার্থা জনস্টন। 'দু'ঘন্টা হয়ে গেল অথচ এখনো মেয়েটার কোন খোঁজ নেই। শেরিফকে আবার ফোন করব।'

'উচিত হবে না, মার্থা,' মিসেস জনস্টনের একটা হাত ধরল নাথান। 'কোন খবর থাকলে উনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে জানাবেন।'

'তাহলে আমি নিজেই বাইরে গিয়ে ওকে খুঁজবো। এখানে বোকার মত আর বসে থাকবো না।'

'কিন্তু তোমার অতিথিরা যে আসতে শুরু করেছেন,' বলল নাথান।

'ওদেরকে তুমি ব্যস্ত রাখো। ওরা টেরও পাবে না আমি বাসায় নেই।'

তিনি হন হন করে ঢুকলেন হলওয়েতে, কাঠের হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে রাখা গ্রেট কোটটি খুলে নিতে মাত্র হাত বাড়িয়েছেন, ডোরবেলের তীক্ষ্ণ চিৎকারে চমকে গেলেন।

'আমরা কি একটু তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম?' বললেন মরিন গ্র্যাডি, চোখের মণি দুই পুত্রধনের মত রোগা তিনি নন। বরং মোটাসোটা এবং ফর্সা। এক জার আচার নিয়ে এসেছেন মহিলা। জারটা বাড়িয়ে দিলেন নানীর দিকে। মিসেস গ্র্যাডির পেছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর স্বামী শন। লাল চুলের পর্বত প্রমাণ মানুষটির হাতে বুশমিলস হুইস্কির বোতল।

'মোটেই না,' পার্টির হাসি উপহার দিলেন মিসেস জনস্টন।

'অনেকেই ইতিমধ্যে এসে পড়েছেন। যান, ভেতরে যান। নাথান আছে ঘরে। আমি একটু অ্যানির খোঁজে বেরুচ্ছিলাম। অতিথিদের সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

শন মিসেস জনস্টনকে হাত ধরে বাড়ির দিকে ঘুরিয়ে দিলেন মুখ।

'ও যেমন আছে তেমন থাকতে দিন,' রায় ঘোষণার সুরে বললেন তিনি। 'হ্যালোউইনের উৎসবে বড়দের নাক গলানো ঠিক না। যে বিষয়টি সম্পর্কে আপনি জানেন না সে নিয়ে চিন্তা করে লাভ কী? ঠিক বললাম কিনা?'

'ঠিক, ঠিক,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে বললেন মিসেস গ্র্যাডি। 'আমরা জো আর জ্যাকির কোন ব্যাপারে নাক গলাতে যাই না। আর ওরা তো পাড়া বেরিয়ে সহি-সালামতেই বাড়ি ফিরে আসে।'

অ্যানির হাত ছেড়ে দিল জ্যাকি, ভাইয়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। জ্যাকি ওর দিকে পেছন ফেরা, এ সুযোগে সামনে ঝুঁকে চট করে মাটি থেকে ইটের টুকরোটা তুলে নিল অ্যানি। ইট তোলার সময় দু'টো শব্দ কানে এল ওর। 'খেলা' এবং 'বাইক'।

হাতে অস্ত্র নিয়ে ঘুরল অ্যানি, কানাগলিটা আরেকবার দেখতে সত্যি পালাবার কোন পথ আছে কিনা। ও ডরপুক নয়, তবে মারকুটে স্বভাবেরও নয়। ও সবসময় মারপিট এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে।

তবে এবারে ভাগ্য ওর সঙ্গে সহায়তা করছে না। কানাগলির পরে একটা দেয়াল সটান উঠে গেছে আকাশে। দেয়ালের পরে বিল্ডিং। বেরুবার কোন রাস্তা নেই ওদিক দিয়ে। কাজেই বেরুতে হবে দুই ড্রাকুলার বাধা অপসারণ করে।

ডানহাতে আধলা ইট নিয়ে ও লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হল। দুই ভাইয়ের উচ্চতা, ওজন, বয়স সবকিছুই অ্যানির চেয়ে বেশি তবে এ লড়াইয়ে জেতার একটাই অস্ত্র আছে তা হল ওদেরকে ভড়কে দেয়া।

এবং সেটাই করতে যাচ্ছে অ্যানি।

ওরা যে মুহূর্তে ফিরল ওর দিকে সঙ্গে সঙ্গে জো'র হাঁটুতে প্রচণ্ড লাথি বসিয়ে দিল অ্যানি। আকস্মিক হামলার বিস্ময় এবং ব্যথায় চক্ষু রসগোল্লা হয়ে গেল জো'র।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠে হাঁটু ভেঙে রাস্তায় পড়ে গেল সে।

একটা গেল। বাকি আছে আরেকজন।

এখন আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে অ্যানি। একটুও ভয় লাগছে না ওর। জ্যাকির সোলার প্লেক্সাসে আধলাটা দিয়ে মোক্ষম একটা আঘাত করলেই ও অজ্ঞান হয়ে যাবে। সেই ফাঁকে ছুটে পালাবে অ্যানি।

পরিকল্পনা মাফিকই কাজ হতো। যদি না আকস্মিক পরিবর্তনটা ঘটত। মাত্র এক সেকেন্ডের মধ্যে সবকিছু কেমন ওলোট পালট হয়ে গেল।

গলিপথটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। নিজেকে মাটিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় আবিস্কার করল অ্যানি, পচা পাতা মুখে লাগছে। এক যমজ, অ্যানি চেনে না কোনজন ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে। অপরজন চেপে ধরেছে পায়ের গোড়ালি। তাকে লাথি মারল অ্যানি, লাগল না। নিষ্ফল আক্রোশে ওর মুখ চেপে ধরা হাতটির নরম তালুতে সজোরে বসিয়ে দিল দাঁত। জ্যাকি, এখন তাকে চিনতে পেরেছে অ্যানি, চিৎকার করে ওর মুখ থেকে সরিয়ে নিল হাত। সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার দিল অ্যানি।

'ওর মুখ চেপে ধরো,' বলল জো। 'নইলে শুনে ফেলবে কেউ।'

জ্যাকির হাত এবারে চেপে ধরল অ্যানির গলা, ধীরে ধীরে চাপ বাড়তে লাগল।

অ্যানি হাতের আধলাটা দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল জ্যাকির মাথায়। বাম ভুরুর ওপরে, কপালে লাগল ইট। দু'ভাগ হয়ে গেল ওখানকার চামড়া। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত, রাস্তায় এলিয়ে পড়ল জ্যাকি।

লাফ মেরে খাড়া হলো অ্যানি, জো'কে ডজ দিয়ে এক ছুটে বেরিয়ে এল কানাগলি থেকে। উড়ে চলল রাস্তা দিয়ে। ওর বিপরীত দিক থেকে একটি পুলিশের গাড়ি আসছিল। ওটাকে বিদ্যুৎ গতিতে পাশ কাটাল সে। দু'মিনিট আগে হলেও পুলিশের গাড়ি দেখলে কৃতজ্ঞচিত্তে গাড়ির দিকে ছুটে যেত সে, সাহায্য চাইত, কিন্তু এ মুহূর্তে ওর পলায়ন ছাড়া গতি নেই। শুনতে পেল পেছনে থেকে শেরিফ ওকে ডাকছে, থামতে বলছে। জ্যাকি গ্র্যাডিকে অত জোরে মারতে চায়নি অ্যানি। জানে খুব জোরে লেগেছে জ্যাকির। হয়তো এজন্য বড় ধরনের ঝামেলায় পড়ে যাবে সে।

তাই ও ডাক শুনেও থামল না। ছুটতেই লাগল।

তারপর পেভমেন্টে ওর পায়ের আওয়াজ ছাপিয়ে সেই শব্দটা শুনল ও যে আওয়াজটা শোনার ভয় করছিল ও : জো গ্র্যাডির গলা, আইনের কর্মকর্তাকে চিৎকার করে বলছে তার ভাইকে খুন করেছে অ্যানি।

কানাগলিতে ঢোকার পরে শেরিফের মনে হল সত্যি বুঝি মারা গেছে জ্যাকি। চিৎ হয়ে পড়ে আছে সে, মুখটা সাদা, মাথা দিয়ে দরদর ধারায় রক্ত ঝরছে।

শেরিফ অজ্ঞান কিশোরটির পাশে হাঁটু মুড়ে বসল, ডান কানের নিচে হাত দিল

পালসের জন্য। আছে। জ্যাকির পালস আছে। যদিও দুর্বল তবু পালস টের পাওয়া যায়। ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

'তোমরা, ছেলেরা এখানে কী করছিলে?' জো'কে জিজ্ঞেস করল শেরিফ জোনাস।

'আমরা মেয়েটাকে ম্যাপল স্ট্রিটে দেখতে পাই,' বলল জো। হাঁটুতে আঙুল ঘঁষছে। লাল হয়ে উঠতে শুরু করেছে ক্ষত।

'আপনি ওর খোঁজ নিতে বলেছিলেন আমাদেরকে। তাই আমরা থামতে বলি।'

'ওর সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

'না। ও একা ছিল। ছুটে পালাচ্ছিল। তাই আমরা ওর পিছু নিই। এখানে এসে ধরে ফেলি।'

'তারপর কী হলো?' নিজের ইউনিফর্ম জ্যাকেট খুলে জ্যাকির মাথায় বেঁধে দিল শেরিফ রক্ত বন্ধ করতে।

'তারপর ও আমার হাঁটুতে লাথি মারে আর জ্যাকির মাথা ফাটিয়ে দেয়।'

লাল গাল হয়ে গেল জো'র। 'বোধহয় ও ভয় পেয়ে গিয়েছিল।' বিড়বিড় করে বলল সে।

'এজন্যই অমন জোরে চিৎকার করছিল?'

নাকিকান্না শুরু করে দিল জো। 'আমি তার কী জানি? আমরা কিছু করিনি। আপনি আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? জ্যাকিকে ও মেরে ফেলেছে।'

অজ্ঞান শরীরটা পাঁজাকোলা করে তুলে নিল শেরিফ।

'গাড়ির দরজা খোলো,' হুকুম করল সে। 'আর কান্নাকাটি বন্ধ করো। তোমার ভাই মরেনি। তবে ক্ষতস্থানে সেলাই লাগবে। ওকে এক্ষুনি ডা. ব্রাউনের কাছে নিয়ে যেতে হবে।'

জো শেরিফের হুকুম তামিল করল। শেরিফ তার যমজ ভাইকে পেট্রল বারের পেছনের আসনে বসিয়ে দিল। শরমিন্দা হয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকল জো।

'ভেতরে ঢোকো,' ড্রাইভিং সিটে বসতে বসতে বলল শেরিফ। 'বাকি কথা পরে শুনবো।'

আবার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে অ্যানি। যেন দৌড়াবার জন্য দৌড়াচ্ছে। ওর দাঁড়িয়ে পড়া উচিত। রাস্তার হদিশ জেনে ফিরে যাওয়া উচিত নানীর কাছে। নানুর কাছে ও নিরাপদে থাকবে। নানু ওর কোন ক্ষতি হতে দেবেন না। মা ঘটনাটা শুনলে কী বলবে? ডনই বা কী বলবে? তারা কি ওকে রিফর্ম স্কুলে পাঠিয়ে দেবে? সারাজীবনের জন্য?

'খোদা,' ছুটতে ছুটতেই প্রার্থনা করল অ্যানি। 'জ্যাকি গ্র্যাডির যেন কিছু না হয়। ওকে তুমি সুস্থ করে দাও। ও যদি সুস্থ থাকে, শপথ করছি, জীবনেও আর এমন কাজ করব না।'

চোখের সামনে ফুটে উঠল কালো পানির রেখা। স্টিলওয়াটার লেক। যাক বাবা,

অন্তত চেনা কিছু একটা চোখে তো পড়ল। নানীর বাড়ি যাবার সময় এ লেকের পাশ দিয়ে গিয়েছিল ওরা। কিন্তু কতক্ষণ আগে? মনে হচ্ছে অনেক বছর। গাড়ির রুট ধরে যদি এগিয়ে যায় অ্যানি, নিশ্চয় একসময় বাড়ির রাস্তাটা চিনতে পারবে।

উন্মত্ত মায়ানেকড়ের ডাকের মত রাতের নৈশব্দ ফালাফালা করে দিল পুলিশের গাড়ির সাইরেন। আসছে এদিকেই। ভয়ানক চমকে উঠেছিল অ্যানি। এক লাফে লেকের ধারের কতগুলো ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। পুলিশের গাড়ির ছাদের ওপরের ঘূর্ণায়মান বাতিটি দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত ওখানেই উবু হয়ে বসে রইল।

এক ঝলক বাতাসে ওর মুখের ওপর ঝাড়ের একটা ডাল এসে পড়ল। গালে পাতার বাড়ি খেয়ে মনে পড়ে গেল জ্যাকির ওকে গলা টিপে ধরার ভয়ংকর দৃশ্যটি।

এখন মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা করা দরকার এসব কী ঘটছে? ওরা এমি সম্পর্কে কী যেন বলেছিল? নিখোঁজ-সবার ধারণা মারা গেছে এমি। নিশ্চয় ঠাট্টা করেছিল ওরা। কিন্তু এ কীরকম বিশ্রী ঠাট্টা। ওরা আসলে অ্যানিকে ভয় দেখাতে চেয়েছিল। ঠিকই বলেছিল এমি। যমজ ভাই দুটো ভয়ানক পাজী।

তবে এমিকেও ওর খুব অদ্ভুত মনে হয়েছে। ও আর ওর গা ছমছমে খেলাগুলো। অ্যানির আসলে এসবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়াই উচিত হয়নি। যতসব ফালতু খেলা।

'ইটস ওকে,' ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন কানের কাছে ফিসফিস করল একটা কণ্ঠ, 'তোমার যদি মন না চায় আমরা আর ওই খেলাটা খেলব না।'

ঘুরল অ্যানি। ওর পাশে বসে আছে এমি, মাথাটা একদিকে কাত করে রাখা, তেরছা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, ঠোঁটে সেই অদ্ভুত, মুখ টেপা হাসি।

দশ

'যমজদের বাবা-মা তোমার বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করল শেরিফ। দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসা হৈচৈ-এর কারণে গলা চড়াতে হচ্ছে তাকে।

'কেন, হ্যাঁ, ওরা তো এখানে,' শেরিফের থমথমে চেহারা দেখে রক্তশূন্য হয়ে গেলেন মার্থা জনস্টন। 'কোন সমস্যা হয়েছে?' জোনাসের হাত চেপে ধরলেন। 'অ্যানিকে পেয়েছো?'

'পেয়েছিলাম।' বাম গালের শুকনো, হালকা ক্ষতচিহ্নে আঙুল ছোঁয়াল জোনাস। কুড়ি বছর আগে মেরী বেথ জনস্টন কাঁচি দিয়ে চিরে দিয়েছিল তার গাল। 'সে দুই যমজ ভাইদের একজনকে ইট দিয়ে বাড়ি মেরে ফাটিয়ে দিয়েছে মাথা।'

বারান্দার সিড়িতে উঠে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন মার্থা। 'ঈশ্বর!' বললেন তিনি। 'কোথায় ও?'

'আবার পালিয়েছে।'

'হায়, জোনাস! তুমি ওকে পালাতে দিলে কেন?'

'বাধা দিতে পারিনি। রক্তক্ষরণে মারা যাচ্ছিল জ্যাকি। ওকে ডাক্তার ব্রাউনের কাছে নিয়ে যাওয়ার খুব দরকার ছিল।'

'ডা. ব্রাউন তো আমার বাড়িতে।'

'আমি ওকে খবর দিয়েছিলাম। আমরা জো'কে হাসপাতালে যাই। জ্যাকির সঙ্গে ও এখন আছে। অ্যানি মেরে ওর হাঁটুতে কালশিটে ফেলে দিয়েছে।'

হাত তুলে কপাল চাপড়ালেন মার্থা। 'ইতিহাস সবকিছু পুনরাবৃত্তি করে।'

'একইভাবে নয়,' গম্ভীর শোনাল শেরিফের কণ্ঠ। 'কুড়ি বছর আগে ঘটনাটি ঘটেছিল বন্ধুদের মধ্যে। আজকের ঘটনাটি ভিন্ন।'

'আর এক ইঞ্চি সামনে লাগলেই তোমার চোখটা ও গেলে দিত।' মার্থার মন চলে গেছে সুদূর অতীতে।

শেরিফ তাঁর কনুই ধরে ফিরিয়ে আনল বাস্তবে।

'আমার কৃতকর্মের ফল ছিল ওটা,' বলল সে। 'আমি মেরীর কাছ থেকে সুবিধে নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। বাবা আমাকে ধরে চাবকে ছিলেন, ডাক্তার মুখে কয়েকটা সেলাই করে দেয়। মেরীকে এক মাসের জন্য সবরকম সামাজিক অনুষ্ঠানে অনাহূত ঘোষণা করা হয়। পরে অবশ্য কেউ আর বিষয়টি নিয়ে কথা বলেনি। কিন্তু সেই সময়ের সঙ্গে এই সময়ের মেলা তফাত। আজকাল লোকে মামলা করে। শন গ্র্যাডি আমার বাবা নয়। ঝামেলায় পড়তে পারো, মার্থা। প্রস্তুত থেকো।'

মিসেস জনস্টন একেকদম সরে গিয়ে ধাক্কা মেরে দরজা খুললেন।

'ভেতরে যাও, জোনাস। ওসব নিয়ে এখন চিন্তা কোরো না। আমি বরং নাথানকে গাড়ি নিয়ে পাঠাচ্ছি। দেখি ও অ্যানির কোন খোঁজ পায় কিনা।'

'যমজ ভাইরা বলল তুমি নাকি নিখোঁজ।'

'ওরা অনেক কথাই বলে,' চুলে আঙুল বোলাচ্ছে এমি। ওর চুলগুলো সবসময়েই কেমন ভেজা ভেজা। 'যা খুশি তাই করে। গুজব রটিয়েও ওরা পার পেয়ে যায়।'

অ্যানির একটা হাত বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরল সে। 'তুমি ব্যাপারটা তাহলে জেনে গেছ, না?'

সিধে হল ও, অ্যানিকে খাড়া করিয়ে ওকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে, লেকের তীরে, অন্ধকার এক জায়গায় এসে দাঁড়াল।

'এদিকে এসো,' বলল এমি। 'তোমাকে একটা জিনিস দেখাই।'

'ওই সময় তুমি আমার মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল অ্যানি। 'ছেলেদুটো নিশ্চয় তোমার কোন ক্ষতি করেছিল। ঠিক?'

নলখাগড়ার একটা ঝোপের ওপাশে, তীর ঘেঁষে একটা কাঠের গুঁড়ি ভাসছে, যেন ঘাপটি মেরে বসে আছে একটা কুমির।

'জো এবং জ্যাকি লোককে জ্বালাতন করে মজা পায়,' বলল এমি। 'এটা খুব খারাপ। ওরা সাইকো। তোমাকে আগেই সাবধান করেছিলাম।'

'তুমি আমাকে সাবধান করো নি যে ইয়ো-ইয়ো'র মত হুট করে আমার মগজে ঢুকে আবার বেরিয়ে যাবে।' বলল অ্যানি। 'এটাকেও আমি ভাল কাজ বলব না। স্বাভাবিক তো নয়ই। বরং অস্বাভাবিকই বলা যায়। তোমার কারণে খুব বাজে একটা অবস্থায় পড়তে হয়েছে আমাকে।'

'দুঃখিত, আমি আর অমন করব না। তবে মাঝে মাঝে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না। ইটস আ গিফট।'

কাঠের গুঁড়ির সামনে হাঁটু মুড়ে বসল এমি, অ্যানিকেও বসতে ইশারা করল।

'গিফট না ছাই,' বলল অ্যানি। 'বরং বলো অভিশাপ। তোমার গিফটের কারণে ঝামেলায় পড়ে গেছি আমি। এমনই ভূতে পেয়েছিল আমাকে, জ্যাকি গ্র্যাডিকে ইট দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি। মরেই গেল কিনা কে জানে!'

'ওদের মত শয়তান একটা ইটের বাড়িতে মরে না,' বলল এমি। 'সে যাকগে, প্রয়োজন হলে আমি তোমার পক্ষ নেবো। এখন আমার একটা কাজ করে দাও।'

'যদি না করি?'

'আমার ওপর বিশ্বাস রাখো। কঠিন কোন কাজ নয়। পানিতে আমার একটা জিনিস পড়ে গেছে। তুলতে পারছি না। তুমি তো আমার চেয়ে অনেক লম্বা। যদি তুমি...'

'জিনিসটা কী?'

'একটা লকেট। আমার মা আমার জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল।'

এগারো

কেসি উইলিয়ামস চুপচাপ বসে আছে আর্মচেয়ারে, উৎকর্ণ কান। ওপর তলা থেকে কোন সাড়াশব্দ শোনা যায় কিনা। পুরোপুরি ঘুম হবার আগেই কোন কারণে বিলিকে সে জাগিয়ে দিলে লোকটা তাকে চাবকে গায়ের ছাল ছাড়াবে। আজ অনেক মার খেয়েছে কেসি, নতুন করে প্রহৃত হতে চায় না। বিলি যখন মাতাল হয় তখন তার সামনেই যাওয়া উচিত নয়। ও বাসায় ফেরার পরে কেসি এমিকে নিয়ে ঝগড়া না করলে আর তার নাক ফাটাত না বিলি।

স্বামীর নাক ডাকানোর অপেক্ষায় বসে রইল কেসি। যখন বুঝল গভীর ঘুমে অচেতন বিলি, পা টিপে-টিপে বাথরুমে ঢুকল সে। অ্যাসপিরিন খেয়ে নাকের অসহ্য ব্যথা কমাবে।

অ্যানি বিস্ফারিত চোখে কাঠের গুঁড়ির গায়ে লেগে থাকা পিচ্ছিল, সবুজ, ঘিনঘিনে কাদার দিকে তাকিয়ে আছে। ওখান থেকে বুড়বুড় করে বিশ্রী গ্যাস বেরিয়ে ফেটে

পড়ছে চারপাশে। শিউরে উঠল ও।

'তুমি আমাকে ওখানে হাত দিতে বলছ?'

'হ্যাঁ,' বলল এমি। 'আমরা তো বন্ধু, তাই না? বন্ধুরা থাকেই একে অন্যকে সাহায্য করার জন্য।'

'ঠিক আছে। আমার কাছে তোমার একটা সাহায্য পাওনা আছে।' গভীর দম নিল অ্যানি। 'একটা লকেট, তাই তো?'

'গুঁড়ির নিচে ওটা আটকে আছে,' বলল এমি। 'আমি লকেটটা হারাতে চাই না। ওতে আমার মায়ের ছবি আছে।'

প্রবল অনিচ্ছা নিয়ে জামার হাতা গোটাল অ্যানি, আঙুল চুবিয়ে দিল স্থির পানিতে। পানি থেকে পচা ডিমের গন্ধ আসছে, হাতটা তুলে আনল ও, ঝাঁকি মেরে ফোঁটাগুলো ঝেড়ে ফেলল। 'থু!' নাক কোঁচকাল অ্যানি। 'কী বোঁটকা গন্ধ।'

'কাজটা করে দাও, ভাই।' অনুনয় করল এমি। 'যত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে পারবে ততোই ভালো।'

'ওখানে যদি কিছু থাকে?'

'কী থাকবে!'

'আমি কী জানি! পোকামাকড়। সাপ। ভয়ঙ্কর কিছু।'

'তোমার পা ধরতে হবে আমাকে?' দাঁতে দাঁত ঘষল এমি। 'খুব জরুরি না হলে কাজটা তোমাকে আমি করতে বলতাম না।'

ছোট্ট, ফ্যাকাসে, অনুনয়ভরা মুখটির দিকে তাকাল অ্যানি।

'তুমি যা জ্বালাতন করতে পারো!' বলে থকথকে কাদার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল সে। গুঁড়ির গায়ে হাতড়াচ্ছে, মনে হলো এক ব্যারেল কিলবিলে পোকার মধ্যে ঢুকে গেছে ওর হাত।

মেবেলিন লেভেভিয দোকান বন্ধ করার ইন্তেজাম করছে। হ্যালোউইন ডে'র কারণে আজ বেচাবিক্রি হয়নি তেমন। লোকে বাড়ি থেকে খুব একটা বেরোয়নি। আর যারা বেরিয়েছে তারা গেছে পার্টিতে। মেবেলিনেরও দাওয়াত ছিল মার্থা জনস্টনের বাড়িতে। ও বাড়ির পার্টি এখনো চলছে কিনা কে জানে। জোনাস কি মিসেস জনস্টনের নাতনীকে খুঁজে পেয়েছে, সেই বাইক চালককে কি ও ধরতে পেরেছে? ভাবছে মেবেলিন নিজেই একবার গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে আসবে কিনা। মার্থার হাতের তৈরী দুর্দান্ত শরবত পান করে আসবে এক গ্লাস। গেলেই হয়।

অকস্মাৎ দমকা হাওয়ায় দড়াম করে খুলে গেল দরজা। মেবেলিন, যে সহজে বিচলিত কিংবা চমকিত হয় না, লাফিয়ে উঠল দরজা খুলে যাবার শব্দে।

বোকার মত ভয় পাচ্ছি আমি, মনে মনে বলল মেবেলিন, তবু সবচেয়ে ধারালো এবং বড় কিচেন নাইফটা নিয়ে দরজাটা বন্ধ করতে গেল।

দরজার হাতলে হাত বাড়িয়েছে সে, দেখতে পেল নির্জন পার্কিংলটে বুগারের মত হামাগুড়ি দিয়ে আছে হার্লি মোটরসাইকেলটা।

ঠিক তখন ভোজবাজির মত কালো গ্লাভ পরা একটা হাত চেপে ধরল ওর মুখ। মেবেলিনের হাত থেকে ছুরিটি মেঝেয় পড়ে গিয়ে শব্দ তুলল। তার পরপরই নিভে গেল সমস্ত বাতি।

'এখানে কিচ্ছু নেই,' বলল অ্যানি। 'একদম ফাঁকা।'

'মনে হয় নিচের দিকে আছে,' বলল এমি। 'আরেকটু নিচের দিকে খোঁজো।'

'পেয়েছি,' গোল, মসৃণ একটা জিনিসের স্পর্শ পেয়েছে অ্যানির হাতের আঙুল। 'কীসে যেন আটকে আছে।' টান দিয়ে ওটাকে ছুটিয়ে আনার চেষ্টা করল। 'গাছের ডাল-টালে বোধহয় আটকে গেছে। এখানে কিছু আগাছাও দেখতে পাচ্ছি।'

'জোরে টান মারো,' পরামর্শ দিল এমি।

ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছে অ্যানির হাত। লকেটটা মুঠো থেকে পিছলে যেতে চাইছে। চেইনটা মুঠো পাকিয়ে ধরে 'হেইয়ো' বলে টান মারল ও। ছিন্ন হলো বাধা, লকেটসহ ওর হাত উঠে এল পানির ওপরে।

এতক্ষণ কতগুলো মেঘের পেছনে লুকিয়ে ছিল চাঁদ, ঠিক এই সময় আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে। জোছনার রূপোলি আলোয় বিবর্ন সোনার ঝিলিক দিল লকেট। মূর্তির মত জমে গেল অ্যানি। অন্ধকারে যেটাকে সে আগাছা ভেবেছে তা আগাছা নয় আদৌ।

মেঘগুলো পর্দার মত আবার ঢেকে দিতে লাগল চাঁদ। আবার ঘনিয়ে এলো আঁধার। চিৎকার করল অ্যানি, পিছলে গেল পা এবং ছপাৎ করে পড়ে গেল পানিতে।

কাঠের গুঁড়ের নিচে অতল গভীর হ্রদে ডুবে যেতে যেতে নল খাগড়া চেপে ধরার চেষ্টা করল অ্যানি। গুঁড়ির নিচে অন্ধকারে সাদা দাঁত বের করে হিহি করে হাসছে যেন ওটা। লকেট চেইনের টানে আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে নর কংকাল, খটখটে হাড়ের হাত বের করে যেন আলিঙ্গন করতে চাইল অ্যানিকে। তারের ফ্রেম, যেটা একসময় ব্যবহার করা হতো হেডব্যান্ড হিসেবে, চক্ষুহীন কোটরের সঙ্গে ওটা শক্তভাবে আটকে আছে। সাদা খুলির সঙ্গে এখনো জড়িয়ে আছে মলিন, বিবর্ণ কিছু চুল, ওগুলোকেই অন্ধকারে আগাছা ভেবেছিল অ্যানি।

ঈষৎ লোনা পানি ঢুকে গেছে অ্যানির মুখে, পা দিয়ে লাথি মারল ও, ওপরে ভেসে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরনের জামা আটকে গেছে কোথাও, টেনেও ছাড়াতে পারছে না। উন্মাদের মত জামা খুলে ফেলার চেষ্টা করল অ্যানি। কিন্তু যত ধস্তাধস্তি করল ততই ওগুলো ফাঁসের মত জড়িয়ে ধরল ওকে। পানির ওজনের চাপে পাতালে নেমে যাচ্ছে অ্যানি, পানিতে ভরে গেছে জুতো, পানি ঢুকছে কানে, নাকের ফুটোয় এবং ফুসফুসে। তারপর নিশ্চিদ্র এক আঁধার নামল। শুধুই অন্ধকার। তারপর আর কিছু মনে নেই অ্যানির।

বারো

'এক্ষুণি আলোগুলো জ্বেলে দেবে তুমি, শুনছ?' পিছু হটে কফি মেশিনের সামনে চলে এল মেবেলিন, কাঁপছে ভয়ে।

কাউন্টারের পেছনে চলে এল বাইকঅলা, মাথা থেকে খুলে ফেলল হেলমেট, বরফ নীল চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল মেবেলিনের দিকে।

'আমাকে মনে পড়ে?' বলল সে। 'এতো ভয় কীসের। আমি তোমাকে কামড়ে দেবো না।'

'আমার বয়ফ্রেন্ড কিন্তু পুলিশ অফিসার,' কুঁইকুঁই করে উঠল মেবেলিন। যদিও জোনাস ওর বয়ফ্রেন্ড নয়।

'তাহলে তাকে ফোন করছ না কেন?' বলল বাইকঅলা। 'আমি অন্তত: অভিযোগ করতে পারব খদ্দেরকে তুমি ছুরি হাতে অভ্যর্থনা কর।'

দরজার দিকে আড়চোখে তাকাল মেবেলিন, ছুরিটি এখনো ব্যাংকোয়েটের নিচে পড়ে আছে। ধস্তাধস্তি করার সময় লোকটা ওটা ওখানে লাথি মেরে সরিয়ে দেয়।

'ও যে কোন মুহূর্তে এখানে এসে পড়বে,' মিথ্যা বলল মেবেলিন।

কিন্তু পাত্তা দিল না বাইকার, ওকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল, শেষে দু'জনের নাকে প্রায় নাক লেগে গেল। লোকটার গরম নিঃশ্বাস আর মুখ থেকে তামাকের গন্ধ পেল মেবেলিন। সাপের মত চক্ষুদুটি নিষ্পলক তাকিয়ে আছে ওর দিকে। শরীর যেন আলগা হয়ে এল মেবেলিনের, পায়ে এক ফোঁটা শক্তি নেই। চোখ সরিয়ে নিল সে।

'জেসি ইবসেন,' নিজের পরিচয় দিল বাইকঅলা। 'একজনকে খুঁজছি।'

মেবেলিনের থুতনি ধরে নিজের দিকে টানল সে, মেবেলিনকে বাধ্য করল তার চোখে চোখ রাখতে। ভয়ে অজ্ঞান হবার দশা মেবেলিনের।

'তোমাকে সেবারই তো বলেছি,' কাঁপা গলায় বলল মেবেলিন, 'মেরী বেথ জনস্টন আর এখানে থাকে না।'

'আমি অন্য আরেকজনকে খুঁজছি।'

'কাকে?'

'এমি নামে ছোট্ট একটি মেয়েকে।'

'যেখানে আছ সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো,' জোনাসের গলা রাগে প্রায় ভাবলেশহীন শোনাল।

মার্থার বাসা থেকে ফেরার পথে সে মেবেলিনের দোকানে একবার ঢুঁ মারার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু দোকানে আলো জ্বলছে না দেখে অবাক হয় জোনাস, রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে বাড়ির আঙিনার সামনে চলে আসে। ওখানে হার্লি মোটর বাইকটি

চোখে পড়ে তার। তখন সে বন্দুক নিয়ে বিল্ডিংয়ের পেছন দিক থেকে সার্ভিস সেন্টার হয়ে ভেতরে ঢোকে। এবং একদম ঠিক সময়েই ঘটে তার আগমন।

'মাথার পেছনে হাত রাখো,' জোনাস বলল বাইকঅলাকে। 'আর কোন চালাকির চেষ্টা কোরো না। বিন্দুমাত্র বেচাল দেখলেই গুলি করব।'

মি. বুলিঙ্গার বলতে পারেননি কেন তিনি তাঁর কুকুর বুচকে নিয়ে লেকের ধারে হাঁটতে গিয়েছিলেন। সাধারণত: এভাবে তিনি ঘরের বার হন না। হতে পারে ট্রিক অর ট্রিট করতে কোন বাচ্চা আসে কিনা, তাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। সেই যে কিশোরী দুটি মেয়ে এসেছিল তাঁর কাছে, তারপর আবার কেউ যায়নি। ওরা নিশ্চয়ই বুকে অনেক সাহস বেঁধে এসেছিল।

ব্যাপারটা আশ্চর্যই বলতে হবে। শিশুদের ভালবাসেন বলে শিক্ষকতার পেশা বেছে নিয়েছিলেন মি. বুলিঙ্গার। কিন্তু অনেক দেরীতে আবিষ্কার করেছেন বেশিরভাগ শিশুই শিক্ষকদের বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ শিক্ষকদের তাদের 'শত্রু' মনে করে।

হ্যালোউইনের সন্ধ্যায় যে কোন কারণেই হোক রাস্তায় বেরুলেও তিনি অকুস্থলে একটু দেরী করেই পৌঁছেছিলেন।

অ্যানিকে পানি থেকে তুলে আনতে গলদঘর্ম হয়ে গেলেন মি. বুলিঙ্গার। কারণ বয়স কম হলেও অ্যানি বেশ ওজনদার এবং জামা-কাপড়, জুতো সব ভিজে তার ওজন আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া মি. বুলিঙ্গার বাতের রোগী। তিনি অ্যানিকে উপুড় করে শুইয়ে পিঠে চাপ দিতে লাগলেন যাতে ফুসফুস থেকে পানি বেরিয়ে যায়। বেশ কিছুক্ষণ পাম্প করার পর অ্যানির মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে বেরুতে লাগল সবুজ কাদা, সে খকখক করে কেশে উঠে গোঙাতে শুরু করল।

বুচকে অ্যানির পাহারায় রেখে মি. বুলিঙ্গার টলতে টলতে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ালেন যদি কোন গাড়ি থামানো যায়।

ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, ওই সময় ওই রাস্তা দিয়ে মার্থা জনস্টনের কালো লিমোজিন চালিয়ে যাচ্ছিল নাথান। মি. বুলিঙ্গারকে দেখে সে গাড়ি থামাল।

এমির মা ফ্যাকাসে চুলের গোছা মাথার পেছনে ঠেলে দিয়ে তাকাল তার ঘুমন্ত স্বামীর দিকে। যখন মাতাল থাকে বিলি, মাতলামির পরে মেয়ের ছেঁড়া টেডি বিয়ারটিকে কোলে জড়িয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। বিলির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভাবছিল কেসি এ লোকটাকে তার অনেক আগেই ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। লোকটা এমির জীবনটাকে নরক বানিয়ে ছেড়েছিল আর কেসি তার মেয়েকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করতে পারে নি।

কিন্তু কেসি যাবে কোথায়? তার তো যাবার কোন জায়গা নেই। তেমন কোন কাজও জানে না যে চাকরি করবে। আর এ বয়সে তাকে কাজ দেবে কে?

দীনহীন চেহারার ওয়ারড্রোবটির দিকে ফিরল কেসি। এ আলমারীতে এখনো তার মেয়ের জামাকাপড় আছে। ফেলে দিতে পারেনি সে। জামা-কাপড়গুলো এমির স্মৃতি বহন করছে। দরজার পেছনে ঝোলানো আয়নায় নিজেকে একবার দেখল কেসি। আলতো করে আঙুল বুলাল নাকে, বিলির থাবড়া খেয়ে এখনো টনটন করছে ব্যথায়। তবে ক্ষতটা মেকাপ দিয়ে মোটামুটি আড়াল করা গেছে।

এবারে পালাবার সময় হলো। পেছনে নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে সে সাবধানে সিড়ি বেয়ে নেমে এল নিচে। তারপর গায়ে চড়াল পুরানো কোট।

মার্থা জনস্টনের বাড়িতে আজ হ্যালোউইন পার্টি। বাইরে যাবার একটা ছুতো হতে পারে এটা। মার্থার নাতনী এসেছে বেড়াতে। বয়স এমির মতোই হবে।

প্রাচীন, অন্ধকার বাড়িটি থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে হাঁটছে কেসি উইলিয়ামস, তার মেয়ে আর অ্যানির কথা ভাবছে। ইস্, ওরা দুজন একসঙ্গে থাকতে পারলে খুব ভাল বন্ধু হতে পারত।

ছোট্ট, বিবর্ণ শরীরটি নলখাগড়ার ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল কালো, বড় একটি গাড়ি এসে থামল রাস্তার ধারে। কাছেই অ্যানির অজ্ঞান শরীরটি মরার মত পড়ে আছে। তার পাশে দাঁড়ানো কুকুরটি, দাঁতমুখ খিঁচানো, আতংকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছিল তার। কিন্তু তার মনিব তাকে এক পা-ও কোথাও যেতে মানা করেছে। তাই সে অ্যানির পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগল।

ছোট্ট শরীরটি দেখছে গাড়ির ড্রাইভার তার গাড়ি থেকে নেমে পাগলের মত হাত-পা ছুড়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা লোকটির সঙ্গে কথা বলছে। যখন লোক দুটি নলখাগড়ার ঝোপের দিকে কদম বাড়ালো, ছোট্ট শরীরটি বুঝতে পারল সাহায্য আসছে, তখন সে ঘুরে দাঁড়াল, নেমে গেল লেকের পানিতে।

নিতম্ব ডুবে গেল তার পানিতে, তারপর কোমর, সবশেষে কাঁধ পর্যন্ত উঠে এল পানি। অবশেষে সবুজ কাদামাটি গ্রাস করল সোনালী চুলের মাথাটি... রইল শুধু বুদ্বুদ।

মার্থা জনস্টন দরজা খুলে দিতে কেসি মধুর একটি হাসি ফুটিয়ে তাকাল তাঁর দিকে। বাড়িটি অস্বাভাবিক নীরব লাগছে। আমোদ স্ফূর্তির কোন সাড়াশব্দ নেই। কোন মিউজিক বাজছে না। ভেসে আসছে না উচ্চকিত হাসির আওয়াজ।

নিজেকে অবাঞ্ছিত লাগল কেসির।

'আমি বোধহয় অনেক দেরী করে ফেলেছি,' কেসির মুখ থেকে মুছে গেছে হাসি।

মার্থা জনস্টনকে বিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। সব সময়কার ফুরফুরে মেজাজটি এ মুহূর্তে একদমই অনুপস্থিত। তিনি কেসির হাত ধরে তাকে হলঘরে নিয়ে এলেন।

'মোটেই না, কেসি,' বললেন তিনি। 'তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। সবাই বাড়ি চলে গেছে। তবে তুমি বসো। এখনও অনেক খাবার-দাবার রয়ে গেছে। খাও।

আর সত্যি বলছি এ মুহূর্তে আমার একজন সঙ্গী খুব দরকার ছিল।'

'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী শুনি? আমি কেবল কিছু তথ্য চেয়েছি।'

জেসি ইবসেন রাগে এত জোরে হাজতখানা গরাদ চেপে ধরল যে তার সাদা হয়ে যাওয়া আঙুলের গিঁটে উল্কি করা শব্দগুলো পরিস্কার ফুটে উঠল। তার ডান হাতে লেখা Love, বাম হাতে Hate.

'আমাকে এসব বলে লাভ নেই,' শেরিফ দরজায় তালা লাগিয়ে চাবির গোছা তুলে দিল তার একমাত্র ডেপুটির হাতে। ডেপুটি ব্রাডফোর্ড ডডসের বয়স খুবই কম। গত বছর এই সময় সে হ্যালোউইন ডে'তে ট্রিক অর ট্রিট খেলেছে।

'হারামজাদার ওপর নজর রেখো, ব্রাড। কোনভাবেই চোখের আড়াল করো না।'

'জ্বী, স্যার,' নার্ভাস গলায় বলল ব্রাডফোর্ড। 'আমি অবশ্যই নজর রাখবো।'

'আমার কিন্তু নাগরিক অধিকার আছে, আপনি জানেন?' ঘুরে চলে যাচ্ছে শেরিফ, পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল বাইকঅলা। 'আমাকে ফোন করতে দিতে হবে।'

ইস্পাত-কঠিন চাউনি ফেরাল সে ডেপুটির দিকে, ছেলেটাকে তার ভীতু এবং সহজ শিকার মনে হয়েছে।

'অ্যাই ব্যাটা ঠোলা,' বলল সে। 'আমার মোটরসাইকেল কই? তোমার বসকে বলে দিও আমি আমার বাহন ফেরত চাই।'

'এইতো অ্যানি, তোমাকে আমি পেয়ে গেছি,' অ্যানির বগলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল নাথান, মি. বুলিঙ্গারকে বলল ওর পা ধরতে।

দুজনে মিলে অ্যানিকে তুলে এনে শুইয়ে দিল গাড়ির পেছনের আসনে। শরীর দ্রুত ঢেকে দিল নাথান একটা কম্বল দিয়ে।

গাড়িতে উঠে বসলেন মি. বুলিঙ্গার। তাঁর কুকুর গুটিসুটি মেরে বসল তাঁর পায়ের কাছে, কুঁইকুঁই করছে আর কাঁপছে।

'চুপ করো, বুচ,' মি. বুলিঙ্গার কুকুরটার মাথা চাপড়ে দিলেন। 'হয়েছে কী তোর? এমন করছিস কেন?'

ঠিক তখন তাঁর চোখ আটকে গেল অ্যানির ডান হাতে, শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে আছে সোনার একটি চেইন। চেইনটি জড়িয়ে আছে কতগুলো সোনালী চুল।

তেরো

শেরিফ অফিসে বসে কম্পিউটারে পুলিশ রেকর্ড চেক করে দেখছে জেসি ইবসেনের বিরুদ্ধে কোন পুলিশি অভিযোগ আছে কিনা। এমন সময় দুপদাপ পা ফেলে থানায় ঢুকলেন শন গ্র্যাডি। সোজা হাসপাতাল থেকে এসেছেন তিনি, তার লাল মুখখানা

আরও লাল হয়ে আছে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হবেন তিনি।

তাঁর লেজ ধরে পেছন পেছন বিরস বদনে এল জো, যেন এখানে আসতে না পারলেই সবচেয়ে খুশি হত। হাসপাতালে অচেতন ভাইয়ের শয্যাপার্শ্বে, বিলাপ করা মায়ের সঙ্গে থাকতে পারলেই বরং ভালো লাগত তার।

কনসোল বন্ধ করে রিভলভিং চেয়ারটা নিয়ে দর্শনার্থীর দিকে ঘুরে বসল জোনাস, যে ঝড় তার ওপর দিয়ে একটু পরে বয়ে যাবে সে জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিল।

'তোমার জন্য কী করতে পারি, শন?'

'কী করতে পারো?' মুখ দিয়ে থুতু ছিটল গ্র্যাডি সিনিয়রের। 'ওই মেয়েটার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আনতে পারো তুমি?'

'ওর এখনো কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি,' ক্লান্ত গলায় বলল জোনাস। 'ওর সন্ধান পাবার চেষ্টা করছি।'

'ওকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে দেয়া মোটেই উচিত হচ্ছে না। বাচ্চা-কাচ্চাদের জন্য ও খুবই বিপজ্জনক। আরো কেউ আহত হবার আগেই ওকে হাজতে পুরে রাখা দরকার।'

'শান্ত হও, শন। আমি আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করছি। নাথান ওকে খুঁজতে গেছে।'

'নাথান! নাথান খুঁজে কী করবে? ওর তো এ বয়সে গাড়ি চালানোই সবার জন্য আশংকার বিষয়। তাছাড়া ও তো মেয়েটার পরিবারেরই লোক। ঘরে বসে আরামে কম্পিউটারে গেমস না খেলে তোমার বরং নিজেই বেরুনো উচিত।'

'আমাকে তুমি আমার কাজ শেখাচ্ছো, শন?' হিমশীতল কণ্ঠ শেরিফের, তাতে ক্ষুরের মত ধার। গ্র্যাডি বুঝতে পারলেন বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন।

'আমি নিয়মিত ট্যাক্স দিই,' বললেন তিনি। 'রাস্তায় আমার বাচ্চারা নিরাপদে হাঁটাহাঁটি করতে পারবে কিনা তা জানার অধিকার আমার আছে।' সামনে ঝুঁকলেন, কটমট চোখে তাকালেন শেরিফের দিকে। 'ডিপার্টমেন্টে তোমার কাজের রেকর্ড খুব ভাল নয়, তাই না মি. জোনাস?'

প্রস্তর মূর্তি হয়ে গেল জোনাস।

'তুমি কি আমার চেয়ে ভাল কাজ দেখাতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তোমার চেয়ে খারাপ যে করব না তা নিশ্চিত। এমি উইলিয়ামসের কী হয়েছিল? একটি বাচ্চা সম্ভবত: মৃত, একজন নিখোঁজ আর আমার জ্যাকি মানসিক শক্তির বলে এখনো কোনমতে টিকে আছে।' এক মাত্রা চড়ল তাঁর কণ্ঠ। 'আর তুমি কাউকে গ্রেফতার না করে এখানে দিব্যি বসে আছ।'

চেয়ার ছাড়ল শেরিফ। 'শুনলে তুমি হয়তো খুশি হবে একজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছি আমি। এক মোটর সাইকেলঅলাকে। অ্যানির নিখোঁজের সঙ্গে তার

সম্পর্ক থাকতে পারে।' সে গ্র্যাডির ছেলের দিকে তাকাল। 'তুমি বলেছিলে গত বছর একজন বাইকারকে দেখেছিলে, জো। আমার ধারণা এ সে-ই লোক। এখন হাজতখানায় আছে। ওকে দেখলে চিনতে পারবে?'

রীতিমত অস্বস্তি লাগছে জো'র। তার বাবা তার দিকে তর্জনী তুলে বললেন, 'কথা বলো।'

জো গলা খাঁকারি দিল। 'আমি চেষ্টা করব। তবে জ্যাকি না থাকলে নিশ্চিত করে কিছু বলা যাবে না।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল জোনাস। 'তাহলে গল্পটা বানিয়ে বলতে সুবিধে হয়?'

চেহারা থমথমে হয়ে উঠল শন গ্র্যাডির, যেন এক্ষুণ ঘটবে বিস্ফোরণ।

'এসবের মানে কী, অ্যাঁ?' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

চেতন-অবচেতনের মাঝখানে রয়েছে অ্যানি।

ওর আবছা মনে পড়ছে মি. বুলিঙ্গার ওপর ঝুঁকে তাকিয়ে রয়েছেন, তারপর ও জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অস্পষ্ট মনে পড়ে ওকে গাড়িতে তোলা হচ্ছে, কম্বল দিয়ে মুড়ে দেয়া হল গা, চালু হয়েছে ইঞ্জিন-তারপর আবার সবকিছু শূন্য। কিচ্ছু মনে নেই।

এখন, সদর দরজা খুলে যাবার পরে কেউ ওকে নিয়ে গেল ভেতরে, কুয়াশার একটা দেয়াল ভেদ করে যেন ভেসে এল নানীর হাহাকারভরা কণ্ঠ।

'ঈশ্বর! ওকে কোথায় পেলে?'

'মি. বুলিঙ্গার পেয়েছেন, আমি না। লেকে।'

নাথানের গলা চিনতে পারল অ্যানি। চোখ মেলে তাকানোর চেষ্টা করে পারল না।

ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে ওর, এমন ঠাণ্ডা মনে হচ্ছে লেকের বরফ জল তার শরীরের শিরায় শিরায় ঢুকে গেছে।

'ও বেঁচে আছে তো?' জিজ্ঞেস করলেন নানী।

'হ্যাঁ। মি. বুলিঙ্গার গেছেন শেরিফকে খবর দিতে।'

'তারচেয়ে বরং ডাক্তারকে খবর দাও। ওর হাতে ওটা কী?'

'জানি না,' জবাব দিল নাথান। 'অনেকবার চেষ্টা করেছি মুঠো খুলতে। পারিনি। এমন শক্ত করে ধরে আছে!'

'হাত। কী আছে অ্যানির হাতে?'

চিন্তা করার চেষ্টা করল ও কিন্তু কিছুই মনে আসছে না। শুধু মনে আছে ও লেকের পানিতে পড়ে গিয়েছিল। মনে পড়ছে কনকনে ঠাণ্ডা পানি চারদিক থেকে চেপে ধরছিল ওকে। চোখ মেলে তাকিয়েছিল গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে। কতগুলো গাছের ডাল দেখতে পেয়েছে-সাদা ডাল।

না, ডাল নয়, মানুষের হাড়গোড়। কংকাল।

দুঃস্বপ্নটা ফিরে এল আবার। হাড়গুলো কালো পানির মধ্যে কেমন ফ্যাকাসে সাদা

দেখাচ্ছিল। কাঠের গুঁড়ির নিচ থেকে মরার খুলিটা সাদা দাঁত বের করে বীভৎস হাসছিল ওর দিকে তাকিয়ে, ওটার মাথায় লেগে থাকা ক'গাছি চুল ভেসে বেড়াচ্ছিল পানিতে।

হঠাৎ মনে পড়ল অ্যানির ওর হাতে কী আছে। মুঠো খোলার চেষ্টা করল জিনিসটা ফেলে দিতে। শরীরটা ঝাঁকি খেল। ও যেন নিশিপাওয়া মেয়ে, ভৌতিক একটা মুঠোয় বন্দী, জানে দুঃস্বপ্ন দেখছে এবং জেগে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

লাউঞ্জ থেকে হলঘরে চলে এল কেসি উইলিয়ামস। বসে বসে শরবত পান করছিল সে। এটা তিন নম্বর গ্লাস। শরীরটা আগের চেয়ে ভাল লাগছে তার।

নাথান এবং মার্থা ওপরতলায় একটি অচেতন কিশোরী মেয়ের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। মেয়েটির গা স্নো কুইনের মত ফ্যাকাসে, বিবর্ণ ত্বক, চুলগুলো মাথার সঙ্গে জমাট বেঁধে লেপ্টে রয়েছে।

'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?' ওপরতলায় এসে জিজ্ঞেস করল কেসি।

মার্থা এক ঝলক তাকালেন ওর দিকে। চিন্তান্বিত চেহারা।

'ডা. ব্রাউনকে একটা খবর দেবে কেসি? বলবে, আমার নাতনীকে লেক থেকে অজ্ঞান অবস্থায় তোলা হয়েছে। যত কাজই থাক, সব ফেলে যেন সে চলে আসে।'

জায়গায় জমে গেছে কেসি। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেয়েটার দিকে। মেয়েটি ডান হাতের মুঠোয় সোনার একটি চেইন ধরে আছে, চেইনটার গায়ে লেগে রয়েছে কিছু চুল। সে তাকিয়ে দেখছে মেয়েটির মুঠো খুলে যাচ্ছে, হাতের আঙুলগুলো ফুলের পাপড়ি মেলার মত এক এক করে খুলে গেল। তার খোলা হাতের তালুতে সোনার গোল ছোট্ট একটি লকেট। লকেটটি স্লো মোশনে খসে পড়ল মেঝেতে, চেইনের সঙ্গে রেগে থাকা কেশগুচ্ছো ঢেকে দিল ওটাকে।

কেসির অসাড় আঙুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে গেল গ্লাস, হাঁটু মুড়ে পড়ে যাচ্ছে সে, লকেটের মতো সে-ও দলামোচড়া হয়ে পড়ল মেঝেতে, মাথাটা ঠকাশ করে বাড়ি খেল রেলিং-এ।

'সেই লোকটার মতই দেখতে ওকে,' মোটর সাইকেল চালকের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল জো। তারপর বাবা আর জোনাসের দিকে তাকিয়ে থেকে পথ করে এগোল সামনে।

'অ্যাই, খোকা,' পেছন থেকে হাঁক ছাড়ল ইবসেন। 'তুমি আর তোমার ভাই যে মেয়েটিকে ধাওয়া করেছিলে তার খবর কী? ওই ছেলেটা তোমার ভাই-ই তো? একইরকম তো চেহারা।'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জো।

'ব্যাপারটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, না? মেয়েদেরকে ভয় দেখানো?'

জো টের পেল ঘাড় থেকে সাঁ সাঁ করে রক্ত ঢুকে যাচ্ছে ওর কালো পরচুলার মধ্যে। 'আমরা কাউকে ভয় দেখাইনি।'

'অবশ্যই ভয় দেখাচ্ছিলে। গত বছরের মত।'

শেরিফ প্রথমে মোটর সাইকেল চালক তারপর ছেলেটির দিকে তাকাল। যখন বুঝতে পারল জো মুখ খুলবে না সে সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল যুবকের সঙ্গে কথা বলতে।

'কথা বলো,' বলল সে। 'তুমি জানো তুমি এখন বিপদের মধ্যে আছ।'

'কীসের জন্য? তোমার গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে গল্প করছিলাম বলে?'

ঝট করে সামনে হাত বাড়িয়ে দিল জোনাস যুবকের কণ্ঠনালী চেপে ধরতে। কিন্তু সে লাফ মেরে সরে গেল।

'আরি, অমন করছ কেন?' বলল সে। 'আমি কী করে জানব সে তোমার বান্ধবী?'

'তোমার যদি কিছু বলার থাকে তো বলে ফেলো,' বলল জোনাস। 'আমি সেলের মধ্যে ঢুকলে কপালে খারাবী আছে কিন্তু!'

'দেখতে পাচ্ছ না কী নিয়ে গুজুর গুজুর ফুসুর ফাসুর চলছে। আমি বিশেষ একটা কারণে রাস্তায় বেরিয়েছিলাম। একজনকে খুঁজতে। সেইজন কে তা কাউন্ট ড্রাকুলা আর তার ভাই জানে।'

'তোমার মুখ থেকেই শুনি।'

'ওরা একটি মেয়েকে ধাওয়া করছিল। আমি নিজে দেখেছি। গতবছরও একই কাজ করেছিল ওরা।'

'কী কাজ?'

'ওদেরকেই জিজ্ঞেস করে দ্যাখো,' বলল বাইকার। 'আমি ঠোলাদেরকে কোন তথ্য দিই না। গত বছর। এই বছর। একই ঘটনা। ওরা একটি মেয়ের পিছু নিয়েছিল। তবে পার্থক্য একটাই-এবারে ছিল অন্য আরেকটি মেয়ে। ব্যস্, আর কিছু বলার নেই আমার।'

চোদ্দ

স্বপ্ন দেখছে অ্যানি। স্বপ্ন তবু স্বপ্ন নয়। একটা স্মৃতি। এমির স্মৃতি। দেখছে এমি বনে গেছে সে আর সে হয়ে গেছে এমি। তবে দু'জনে মিলে একজন মানুষে পরিণত হয়েছে।

এ হলো সেই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা যেটা ঘটেছিল কানা গলিতে। ওখানে হঠাৎই এমি ঢুকে পড়েছিল অ্যানির ভেতরে। কিছুক্ষণের জন্য সে এমি হয়ে গিয়েছিল। অ্যানি চেষ্টা করলেও এমির বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

অ্যানির গ্র্যানি গেছেন পাশের ঘরে কেসি উইলিয়ামসের জন্য বিছানা করে দিতে। নাথান নিচতলায় বসে মদ্যপান করছে নার্ভগুলো সতেজ রাখতে।

অ্যানির ইচ্ছে করছে জোরে কেঁদে ওঠে। কিন্তু ও কাঁদতে পারছে না। এই সময় এমি এসে ভর করল ওর ওপর।

অ্যানি দেখছে সে কী করে যেন ওই যমজ দুই ভাইয়ের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। আবার ছুটে পালাচ্ছে সে, কাঁটা গাছের ঝোপে লেগে ছড়ে যাচ্ছে হাত-পা, ওর জামা-কাপড় আটকে যেতে চাইছে। ও শুনতে পাচ্ছে ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে ওর পিছনে ছুটে আসছে ছেলে দুটো। ক্রমে কাছিয়ে আসছে তাদের পদশব্দ।

হঠাৎ ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এলো অ্যানি ওরফে এমি। খোলা একটি জায়গায় চলে এসেছে। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, বর্ষণের তীব্র ধারা ওর দৃষ্টি ঝাপসা করে দিচ্ছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে।

ঝুপঝুপ বৃষ্টির চাদর ভেদ করে ফুটে উঠল একটি আলোকরেখা, ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অ্যানি ওরফে এমি ছুটে চলে এল রাস্তার মাঝখানে, পাগলের মত হাত নাড়ছে, থামতে বলছে চালককে।

'বাঁচাও!' চিৎকার দিল ও। 'আমাকে বাঁচাও!'

কালো পোশাকধারী তার বাহনের ব্রেক কষল। তার হেলমেটের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ে আতশবাজির মত নাচছে, পিছলে যাচ্ছে তার জ্যাকেট বেয়ে, প্যান্টে, তারপর চকচকে বুট জুতোয়।

যেন একটা মূর্তিমান শয়তান বসে আছে হার্লি মোটরবাইকে।

এক পা মাটিতে রেখে ভারসাম্য রক্ষা করল সে, হেলমেটের কাঁচ তুলে তাকাল। তার চোখজোড়া বরফ নীল। 'কী হয়েছে, খুকী?' জানতে চাইল সে।

অ্যানি ওরফে এমি বাইক চালকের জ্যাকেটের আস্তিন চেপে ধরল, টের পেল জামার নিচে তার কঠিন পেশির আভাস।

'আমাকে বাঁচান,' আকুতি করল সে। 'দুটো ছেলে...'

'ওরা তোমাকে বিরক্ত করছে?'

'ওদের কাছে ছুরি আছে...'

বাইক চালক ওর মাথার ওপর দিয়ে তাকাল। ঘুরে লোকটির দৃষ্টি অনুসরণ করল ও। গ্র্যাডি ভ্রাতৃদ্বয় ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে, মোটর সাইকেল আরোহীকে দেখেই তারা অ্যাবাউট টার্ন করল। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল। লোকটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'কী নাম তোমার খুকী?' হেলমেটের ভেতর থেকে ভেসে এল ভৌতিক একটা কণ্ঠ।

'এ-এমি উইলিয়ামস।'

পেছনের অতিরিক্ত আসনের গায়ে থাবড়া মারল ওর রক্ষাকর্তা। 'তোমার ভাগ্য ভাল আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, এমি। সিটে উঠে বসো। আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থাকো। আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবো।'

একেকবারে দু'ধাপ করে সিড়ি টপকাল শেরিফ, সিড়ির শেষ মাথায় দেখা হয়ে গেল ডা. ব্রাউনের সঙ্গে। 'খবর কী, ডাক্তার?'

'শক, দু'এক জায়গায় ছড়ে-কেটে গেছে, শরীরের তাপ একদম নেমে গেছে। ওকে আমি স্বল্পমাত্রার সিডেটিভ দিয়েছি। ওর এখন চমৎকার একটি ঘুম দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল জোনাস। ডা. ব্রাউন গেলেন পাশের শয়ন-কক্ষে কেসি উইলিয়ামসকে পরীক্ষা করে দেখতে।

অ্যানির ঘরে ঢোকার আগে মাথা থেকে ক্যাপটি খুলে নিল শেরিফ। মার্থা নাতনীর শিয়রে বসে আছেন, অ্যানির একটা হাত ধরে রেখেছেন, শেরিফের উপস্থিতি টের পেয়ে তার দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকালেন। এই কয়েক ঘন্টায়ই ভদ্রমহিলার বয়স যেন বেড়ে গেছে দশ বছর। গোলাপী গালের লালিমা অদৃশ্য, মুখখানা রক্তশূণ্য, মরার মত। শেরিফ সিদ্ধান্ত নিল আগামী বছর সে তার শহরে কোন হ্যালোউইন ডে পালন করতে দেবে না।

ছায়ার মত নীরবে শুয়ে আছে অ্যানি, গোলাপী পাজামার মধ্যে যেন একটি মমি। তার ম্যাড়মেড়ে বাদামী চুল ছড়িয়ে পড়েছে হলুদ বালিশে। ওর মা এ বয়সে দেখতে অবিকল এরকমই ছিল। কী-যে অদ্ভুত মিল মা-মেয়ের চেহারায়। অ্যানিকে যদি কেউ আঘাত করে থাকে... চোয়াল শক্ত হল জোনাসের। সে এগিয়ে গিয়ে মেয়েটির ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'ডা. ব্রাউন বললেন ও ঠিক হয়ে যাবে।' মার্থার কণ্ঠে স্বস্তি।

'উনি তো খুবই ভাল ডাক্তার।'

বৃদ্ধা একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁকে সিধে হতে সাহায্য করল শেরিফ।

'সব ভালো যার শেষ ভালো তার, তাই না?' বলল সে।

'ঘটনার এখনও বাকি আছে, জোনাস। তোমাকে একটা জিনিস দেখাবো আমি।'

মিসেস জনস্টন একটি সোনার লকেট দিলেন শেরিফের হাতে। 'নাথান অ্যানিকে বাড়ি নিয়ে আসার পরে ওর হাতে এটা পাই আমি।'

জোনাস লকেটটা উল্টে দেখল।

'ভেতরে একটা লেখা আছে,' বললেন মিসেস জনস্টন। 'পড়ো।'

জোনাস লকেটে ছোট্ট বোতামে চাপ দিতেই খুলে গেল ওটার ডালা। ভেতরে ফ্যাকাসে চেহারার এক মহিলার বিবর্ণ ছবি। ডালার মধ্যে লেখা : *'এমিকে তার চোদ্দতম জন্মদিনে। ভালবাসাসহ মা।'*

হাসাপাতালে নিজের বিছানায় নড়েচড়ে উঠল জ্যাকি গ্র্যাডি। চোখ মেলল। তাকাল চারপাশে। তার মা বিছানার শেষ মাথায় বসে ঢুলছে, হাতের মুঠোয় লেসঅলা দোমড়ানো, মোচড়ানো একখানা রুমাল। আবার চোখ বুজল গ্র্যাডি।

কোন একটা ভজঘট হয়ে গেছে। টের পাচ্ছে সে। জো, তার বাবা আর মেয়েটাকে নিয়ে কিছু একটা ঘটেছে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে যমজ ভাইয়ের কোন

সমস্যা বা ঝামেলা হলে সে টের পেয়ে যায়। তার ভাইটি অবশ্য তার মত অতটা নির্দয় এবং নিষ্ঠুর নয়। বিপদে পড়লে ভয়ে সিটিয়ে যাবার ছেলেই নয় জ্যাকি। সে জানে কী করতে হবে।

ওই মেয়েটার কারণে যদি তাদেরকে কোন ঝামেলায় পড়তে হয় তাহলে... মেয়েটাকে দেখে নেবে সে। তবে আগে মাকে এখান থেকে ভাগানো দরকার।

মা'র হাত স্পর্শ করল সে, সঙ্গে সঙ্গে জেগে গেলেন মিসেস গ্র্যাডি, দুঃস্বপ্ন দেখার মত চমকে উঠলেন, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দু'চোখ অশ্রুতে ভরে গেল তাঁর।

'ওহ্, খোকা,' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। 'তোর জ্ঞান ফিরেছে। কেমন লাগছে?'

'মাথাটা ঘুরছে আর দুর্বল লাগছে শরীর।'

'ওই মেয়েটা। ওকে ছাড়বোনা আমরা।'

'সত্যি ও হয়তো এত জোরে আমাকে মারতে চায়নি।' বলল সে।

খাড়া হতে গেলেন মিসেস গ্র্যাডি। 'আমি নার্সকে খবর দিচ্ছি।'

তাঁকে নিবৃত্ত করল জ্যাকি। 'দরকার নেই। আমি ঠিকই আছি। শুধু বিশ্রাম নিলেই কেটে যাবে দুর্বলতা।'

মিসেস গ্র্যাডির চোখে চোখ রাখল সে। জ্যাকির চোখে মা'র জন্য ভালবাসা।

'তোমাকেও খুব ক্লান্ত লাগছে, মা।' বলল সে। 'তুমি বাড়ি গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

চোখের জলে ভেজা মুখ মুছলেন মিসেস গ্র্যাডি।

'হ্যাঁ, একটু ক্লান্ত লাগছে বইকি। তুই একা থাকতে পারবি? সমস্যা হবে না?'

'বিন্দুমাত্র না। আমি তো হাসপাতাল আছি। তাহলে আমাকে নিয়ে এত চিন্তা করছ কেন? তুমি এখন বাড়ি যাও। কাল সকালে আবার দেখা হবে।'

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস গ্র্যাডি, পা বাড়ালেন দরজায়। কোট গায়ে দিলেন। তারপর ছেলের দিকে ফিরে বললেন, 'জানিস, জ্যাকি, মাঝে মাঝে ভাবি কোন পুণ্যের ফলে তোদের মত দুটি চমৎকার ছেলের মা হয়েছি আমি!'

দরজা বন্ধ করে চলে গেলেন তিনি।

'ও এটা কোথায় পেল?' শেরিফ মনোযোগ দিয়ে দেখছে লকেটটি।

'আমি জানি না। ওর জ্ঞান ফেরেনি বলে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। কিন্তু এ লকেটটি দেখামাত্র জ্ঞান হারায় কেসি উইলিয়ামস। রেলিং-এর সঙ্গে বাড়ি খেয়েছে সে।' নিস্প্রাণ হাসলেন মার্থা। 'আমার বাড়ি তো এখন হাসপাতাল। ডাক্তার কেসির সেবা করছে।

'আমি ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলব।'

'আরেকটা কথা।'

জোনাস পকেটে রাখল লকেট। 'কী?'

'অ্যানির হাতে এগুলোও ছিল।'

মিসেস জনস্টন একটা টিস্যু পেপার দিলেন শেরিফকে। মোড়কটা খুলল সে। ভেতরে ফ্যাকাসে রঙের কতগুলো শুকনো চুল।

'এ চুল অ্যানির নয়।' বলল সে। 'ওর চুল অনেক সুন্দর।'

ওরা পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করলেন, কী ভাবছেন সে কথা একজন অপরজনকে বললেন না।

অবশেষে গলা খাঁকারী দিল জোনাস।

'আশাকরি সিডেটিভের কল্যাণে বেশিক্ষণ ঘুমাবে না অ্যানি। ঘুম ভাঙলেই ওর সঙ্গে কথা বলব আমি।'

এমির অভিজ্ঞতাগুলো স্বপ্নের মধ্যে চাক্ষুস করছে অ্যানি। দেখছে বৃষ্টির মধ্যে অপরিচিত লোকটির সঙ্গে মোটরসাইকেলে চড়ে ছুটে চলেছে সে। কিন্তু কোথায় যাচ্ছে জানে না। যেন অন্য কোথাও, অন্য গ্রহে ছুটে চলেছে ওরা।

একটি অন্ধকার, পুরানো বাড়ির ড্রাইভওয়েতে ঢুকল হার্লি। একটি ফ্যামিলি কার-এর পাশ কাটিয়ে বাড়ির বারান্দার সিড়ির সামনে এসে মোটর সাইকেল থামাল চালক।

'ঠিক আছে, এমি উইলিয়ামস।' বলল মৃত্যু দূত। 'নেমে পড়ো। এখানে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলব।'

মা হাসপাতাল থেকে চলে গেছেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত সবুর করল জ্যাকি। আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল সে ডাবল নিশ্চিত হতে। অনুমান করল, মা বাড়ির রাস্তার অর্ধেকটা পার হয়েছেন, নিঃশব্দে সে বিছানায় উঠে বসল, হাসপাতালের চাদরের তলা থেকে বের করল পা। বিপরীত দিকের আয়নায় তার প্রতিবিম্ব নকল করল তাকে। মাথার মস্ত ব্যাণ্ডেজে সে হাত বুলাল।

ওকে সত্যি অসুস্থ রোগীর মত দেখাচ্ছে। চমৎকার। কোন ঝামেলা হলে বলতে পারবে অসুস্থতার কারণে তার মস্তিষ্ক কাজ করছিল না, সে বুঝতে পারেনি কী করছে।

তবে হ্যালোউইন ডে হলেও হাসপাতালের গাউন পরে রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করা সম্ভব নয়। চারপাশে তাকাল জ্যাকি। একটা চেয়ারে নিজের জামাকাপড় দেখতে পেল সে। মা পরিপাটি করে গুছিয়ে রেখেছেন। দ্রুত কাপড় পরতে লাগল জ্যাকি।

পনেরো

'আমার বউ এখানে?' মার্থা জনস্টনের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে টলছে বিলি উইলিয়ামস, চোখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে।

'জ্বী, স্যার।' কাঁপা গলায় বলল নাথান। 'উনি ওপরতলায় আছেন।'

'ওখানে সে কী করছে?'

'ওর শরীর ভালো না,' কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন মিসেস জনস্টন। 'অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। ওকে চা খাওয়াতে যাচ্ছি।'

নাথানকে পাশ কাটিয়ে হলওয়েতে ঢুকে পড়ল উইলিয়ামস।

'চা-ফার কথা ভুলে যান। ওকে নিয়ে আসুন। ওকে বলুন আমার সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছে সে।'

'এখন উনি বাড়ি যেতে পারবেন না,' বলল শেরিফ। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সে, ক্যাপটা বাম হাতের তর্জনীর গোড়ায় ঝুলছে। 'মাথায় আঘাত লেগেছে। পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছেন।'

'আমি ওকে বাড়ি নিয়ে যাবো,' মদের প্রভাব এখনো কাটেনি বলে শেরিফের প্রচ্ছন্ন হুমকীটা বুঝতে পারেনি। 'একটা মানুষ তিনদিন ধরে রাস্তায়, বাড়ি ফিরে আসার পরে তাকে অন্তত: রাতের খাবারটা রেঁধে দেয়া দরকার। ওকে বলুন এখুনি যেন নিচে নেমে আসে।'

ধীর গতিতে সিড়ি বেয়ে নামতে লাগল জোনাস।

'তুমি কি কানে কম শোনো, বিলি?' বলল সে। 'বললাম না উনি নড়াচড়া করতে পারবেন না। এখন বাসায় ফিরে নিজেই আণ্ডা ভেজে খাও গে।'

'আমি কী করব না করব তা তোমাকে বলে দিতে হবে না।'

শেরিফ মেঝেতে পা দিতেই তার দিকে ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের মত ছুটে গেল উইলিয়ামস। ঝট করে একপাশে সরে দঁড়িয়ে বিলির মোটা কব্জিটা ধরে মুচড়ে পিঠের কাছে নিয়ে এল জোনাস।

'কথায় কথায় হাত চলে, না?' বিলির কানের কাছে মুখ এনে হিসহিস করল সে। 'কেসির নাকে বিশ্রী একটা ক্ষত দেখলাম। কোথ্থেকে এলো ওটা?'

পুলিশ অফিসারের বজ্রমুষ্ঠি থেকে রেহাই পেতে ধস্তাধস্তি করছে উইলিয়ামস। 'দরজায় বাড়ি খেয়েছে নিশ্চয়,' দাঁতমুখ খিঁচাল সে। 'আমি কী জানি?'

'আমি কী বলি, জানো?' বলল জোনাস। 'তোমাকে একরাত গারদে পুরে রাখলে অনেকেই খুশি হবে।'

'অপরাধটা কী আমার?'

'পুলিশ অফিসারকে অপমান।' বলল জোনাস। 'নাথান-দরজাটা প্লীজ।'

'জ্বী, স্যার,' নাথান খুলে দিল দরজা, শেরিফ উইলিয়ামসকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে চলল তার গাড়িতে।

পাশের বাড়ির একটা ঝোপের আড়ালে ঘাপটি মেরে ছিল ছায়ামূর্তিটা। পুলিশের গাড়িটির টেইল-লাইটগুলো অন্ধকারে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে। তারপর বেড়ার ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়ল মার্থা জনস্টনের পেছনের বাগানে।

নিচতলার লাউঞ্জে চলা পার্টি শেষ হয়েছে। আরও বেশ কিছুক্ষণ আগে। এখন প্রায় মাঝরাত। কিচেনের বাতিটি ছাড়া নিচতলার বেশিরভাগ ডুবে আছে আঁধারে।

ছায়ায় হামাগুড়ি দিয়ে এগোলো ছায়ামূর্তি, অ্যানির বেডরুমের আলো নিভে যাওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল। তারপর লঘুপায়ে চলে এল উইলো গাছের নিচে। শেষবারের মত ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকটা দেখে নিয়ে গাছের গুঁড়িতে পা রাখল সে। আস্তে আস্তে গাছ বাইতে লাগল। শেষে একটা ডাল হাতে ঠেকতে যাত্রা বিরতি দিল সে। হাঁপাচ্ছে বেদম। সুস্থির হতে সময় নিল। তারপর ডালে উঠে বসল সে। অ্যানির বেডরুমের জানালাটা এখন ঠিক তার সামনে। হাত বাড়িয়ে ছিটকিনি খুঁজল। অ্যানি জানালার ছিটকিনি না লাগিয়েই চলে গিয়েছিল।

অনুপ্রবেশকারী ধীর গতিতে জানালার কাঁচ তুলল, এক পা রাখল চৌকাঠে তারপর ঢুকে পড়ল ভেতরে।

জেসি ইবসেন পরে তার বন্ধুদেরকে বড়াই করে বলেছিল স্টিলওয়াটার জেল থেকে পালাবার মত সহজ কাজ পৃথিবীতে নেই। বিশেষ করে ব্রাডফোর্ড ডডসকে বোকা বানানোটা ছিল আরও সহজ।

একজন কয়েদীর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, কাছেপিঠে ডাক্তারও নেই, ওদিকে জোনাসকে দিতেও ভয় লাগছিল, এমতাবস্থায় ডেপুটি ডডস নিজেই চরম সিদ্ধান্তটি নিয়ে ফেলল। তবে পরে প্রমাণিত হলো সিদ্ধান্তটি ছিল ভুল। সে সঙ্গে কোন পুলিশ না নিয়েই ইবসেনের কারা প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ল এবং মাটিতে যন্ত্রণায় গড়াগড়ি খেতে থাকা কয়েদীটির কাছে এগিয়ে গেল তাকে সাহায্য করতে।

ডডসকে কুপোকাৎ করে তার পকেট থেকে চাবি নিয়ে মুক্ত হয়ে সেল থেকে বেরিয়ে যেতে মাত্র কুড়ি সেকেন্ড সময় লাগল জেসি ইবসেনের।

রাতের দ্বিতীয় কয়েদী বিলি উইলিয়ামসকে নিয়ে থানায় ফিরে শেরিফ দেখে ডডসকে ইবসেনের সেলে তার নিজেরই হ্যা কাফ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে এবং বাইকঅলা অদৃশ্য।

'একী ব্রাড,' অবাক হয়ে জোনাস জিজ্ঞেস করল তার সহকারীকে। 'তুমি ওকে পালাতে দিলে কী করে? কী হয়েছে?'

'আমি ভেবেছিলাম ওর হার্ট অ্যাটাক হয়েছে,' সাফাই গাইবার চেষ্টা করল ডডস। 'এমন অভিনয় করছিল বিশ্বাস না করে পারিনি।'

'বিশ্বাস তো করতেই হবে!' অট্টহাসিতে পেটে পড়ল বিলি। তাকে ইবসেনের পাশের সেলে ফুকিয়ে দিয়েছে জোনাস।

'চুপ করো, বিলি, এটা কোন হাসি-ঠাট্টার বিষয় নয়।'

'সে একটা মেসেজ রেখে গেছে।' জানাল ডডস।

'রক্ত দিয়ে লেখা মেসেজ?' মশকরা করল উইলিয়ামস।

'বলেছে আমরা যেন তার শুভেচ্ছা পৌঁছে দিই এমিকে।'

অকস্মাৎ কবরের নিস্তব্ধতা নেমে এল জেলখানায়। বিলি উইলিয়ামসের মুখ থেকে উবে গেছে হাসি।

শেরিফ এমন দৃষ্টিতে তাকাল ডডসের দিকে, ডেপুটির পেটের ভাত চাল হয়ে গেল। সে হ্যা কাফ খুলে সেল থেকে বের করে নিয়ে এল তার সহকারীকে। ঢুকল অফিসে।

'টেক ইট ইজ, শেরিফ,' ব্রাডফোর্ড ডডস বুঝতে পেরেছ সে এমন বেমাক্কা একটি মন্তব্য করে বসেছে যা বলা মোটেই উচিত হয়নি।

'তোমার মাথায় কি বুদ্ধি-শুদ্ধি কোনদিনই হবে না!' বলল জোনাস, তবু ডডস তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে দেখে যোগ করল, 'তুমি যার কথা বললে সে ওই লোকটার মেয়ে। যাক গে, বাদ দাও। যাও, আমার জন্য একটা বার্গার আর কিছু আলুভাজা নিয়ে এসো।'

বিব্রত সহকারী খাবার কিনতে থানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে জোনাস রেডিও নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে জেসি ইবসেনের পলায়নের খবর জানিয়ে দিল। বলল সন্দেহ করা হচ্ছে এই মোটরসাইকলে চালক একটি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। এক বছর আগে এমি উইলিয়ামসের নিখোঁজ হবার সঙ্গে এর সম্পর্ক রয়েছে।

শেরিফ এবং তার ডেপুটি চলে যাওয়ার পরে প্যান্টের পেছনের পকেট থেকে আধখাওয়া ওয়াইল্ড টার্কির বোতল বের করল বিলি।

এমিকে শুভেচ্ছা জানাতে বলেছে। বাইকঅলা এ কথা বলে কী বোঝাতে চেয়েছে? লোকটা আসলে কে? কী নিয়ে কথা বলছে সে? মোচড় দিল বিলির পেট। চুপিচুপি গেলার জন্য মদের বোতলটা মুখের সামনে উঁচু করে ধরল সে। খালি পেটে তরল পদার্থটা স্রোতের বেগে ঢুকল, মাথাটা কেমন চক্কর দিল। তবে এতে অন্তত: তার মানসিক যন্ত্রণাটা কমবে। কেসিকে ওর বাড়ি নিয়ে যেতেই হবে রান্না করার জন্য। এখনও পেটে একটা দানা পড়েনি বিলির। মহিলাটা আসলে একটা বোকা। ওকে বিয়ে করাই উচিত হয়নি বিলির। মহিলা কিছুই দিতে পারেনি তাকে, শুধু এমিকে ছাড়া।

এমি তার জানের জান। মেয়ের কথা মনে হতে অশ্রুসজল হয়ে উঠল বিলির চোখ, শিরাযুক্ত নাকের পাশ দিয়ে গড়িয়ে নামতে লাগল পানি। এমিকে সে খুব মিস করছে।

হঠাৎ বরফ শীতল দমকা একটা হাওয়া বয়ে গেল কারা প্রকোষ্ঠের ভেতরে। শিরশির করে উঠল বিলির গা। যখন সে এমির বয়সী ছিল, এভাবে শিউরে উঠলে বাচ্চারা বলত একটা ভূত এইমাত্র হেঁটে গেল তোমার কবরের ওপর দিয়ে। যত্তোসব ফালতু কুসংস্কার! সবাই জানে ভূত বলে কিছু নেই দুনিয়ায়। মাথাটা পিছিয়ে নিল বিলি, আরেক ঢোক মদ পান করে শীতল হাড় গরম করে নেবে। হঠাৎ একটা খসখস

আওয়াজ তার মনোযোগ আকর্ষণ করল। সেলের উঁচু দেয়ারের মাথায় ছোট গরাদঅলা একটি জানালা, ওখানে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। খসখস শব্দ হচ্ছে।

বোতলের মুখে ছিপি এঁটে সিধে হলো বিলি। ডানদিকে, গরাদঅলা জানালাটার দিকে এগিয়ে গেল। গলাটা সারসের মত বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল খসখস আওয়াজের উৎসটা কী।

গরাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিল ছোট্ট, যন্ত্রণাকাতর একটি মুখ। মুখটির সঙ্গে তার মেয়ের চেহারার অস্বাভাবিক একটা মিল রয়েছে। মেয়েটার ঠোঁটজোড়া পিছনের দিকে বেঁকে গিয়ে বিকৃত, বীভৎস একটা হাসির ভঙ্গি তৈরী করল।

'অ্যাই, বাবা,' ডাকল ওটা।

বিলির হাত থেকে হুইস্কির বোতল খসে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভাঙল। আতংকে আর্তনাদ করল বিলি।

শেরিফ মাত্র রিসিভার নামিয়ে রেখেছে এমন সময় বোতল-ভাঙার শব্দ শুনতে পেল সে, সে সঙ্গে ভীতিকর চিৎকার। সে ছুটে গেল বিলির সেলে। দেখল হুইস্কির পুকুরে হাঁটু মুড়ে বসে আছে বিলি উইলিয়ামস, তার হাত কেটে কেটে ভাঙা কাঁচে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে, বিকট চিৎকার করতে করতে সে বলছে এমির ভূত এসেছিল তাকে ধরতে।

ষোল

অ্যানি বিছানায় শুয়ে আছে। কিন্তু এটা কার বিছানা? ঝিমানো ভাব নিয়ে চারপাশে তাকাল ও। দেয়ালে পপ তারকাদের ছবি। বহুক্ষণ বাদে, যেন এক যুগ পরে নিজেকে নিরাপদ মনে হলো অ্যানির।

তবে তা এক মুহূর্তের জন্য মাত্র।

কালো একটা মেঘ নেমে এল ওর ওপর। শ্বাস নিতে পারছে না অ্যানি। কেউ কিছু একটা চেপে ধরেছে ওর মুখের ওপর। একটা বালিশ। হাত-পা ছুড়তে লাগল অ্যানি, বালিশের একটা কিনারা ধরে চেষ্টা করছে ওটা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে।

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ সময়ে সফল হলো অ্যানি, বালিশটা মুখের ওপর থেকে সরাতে পারল ও এক লহমার জন্য। মুখ হাঁ করে দম পুরে নিল বুকে, ওই এক সেকেণ্ডের মধ্যেই চাঁদ-তারা আর সোনালী চাঁদ আঁকা ছাতের দিকে দৃষ্টি চলে গেল ওর।

অ্যানি বুঝতে পারল সে নিজের ঘরে চলে এসেছে। গ্র্যানির বাড়িতে।

বালিশটা আবার নেমে এল ওর মুখের ওপর। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ঠেলে সরাতে পারছে না। হামলাকারী তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। যতক্ষণ পারল নিঃশ্বাস

বন্ধ করে রইল অ্যানি, যতক্ষণ ওর শরীরে কুলালো, ওর শরীর থেকে বেরিয়ে গেল কার্বন ডাইঅক্সাইড, একটু বাতাসের জন্য বেদম ছটফট করছে ও। মাথাটা ঝিমঝিম করছে, চোখের সামনের সাদা আলোর ফুলঝুড়ি। মনে হলো আবার পানিতে পড়ে গেছে ও, ডুবে যাচ্ছে। মাথাটা যেন বিস্ফোরিত হবে।

কোথায় যেন পড়েছিল অ্যানি মানুষ কয়েক সপ্তাহ না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে, জল পান না করে বাঁচে কয়েকদিন কিন্তু বাতাস ছাড়া তিন মিনিটও টিকতে পারে না। অক্সিজেনই জীবন।

না, না, তারস্বরে চিৎকার করছে ওর মন। আমি মরতে চাই না।

তারপর, ওপরঅলা যেন শুনতে পেলেন ওর আর্তনাদ, মুখের ওপরে ওজনটা হঠাৎ নির্ভার হয়ে গেল। অ্যানির খালি ফুসফুসে হু হু করে ঢুকল জীবনদায়ী অক্সিজেন। কানে শোঁ শোঁ গর্জন। গর্জন ছাপিয়ে অন্ধকারে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ ভেসে এল।

বুক ভরে বাতাস নিয়ে বিছানায় উঠে বসল অ্যানি এবং ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগল গ্র্যানিকে।

তবে ঘরের বাতি জ্বেলে দিল কেসি উইলিয়ামস, আলোর বন্যায় ভেসে গেল কামরা, উদ্ভাসিত হলো সবকিছু।

বিছানার এক কোণে, পালকের তৈরী লেপটা থুতনি পর্যন্ত টেনে নিয়ে কুঁকড়ে বসে আছে অ্যানি।

ঘরের মাঝখানে, গালিচার ওপর মারামারি করছে দুজন। একজনের চেহারা বেজির মত, পরনে কালো চামড়ার পোশাক, অপরজন একটি কিশোর, তার মাথায় ব্যান্ডেজ, গায়ে ভ্যাম্পায়ারের ড্রেস।

'কী হচ্ছে!' ছুটতে ছুটতে এলেন মার্থা জনস্টন, কেসিকে ঠেলে সরিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলেন জ্যাকি গ্র্যাডি বাইকঅলার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে হাঁপাচ্ছে।

'আমি ওকে এখানে আসতে দেখেছিলাম,' ইবসেন কিছু বলার আগেই হড়বড় করে বলল জ্যাকি। 'আমি ওর পিছু নিই। ও অ্যানিকে দম বন্ধ করে মারতে চাইছিল।'

'কী তুমি...' ছেলেটার দিকে তেড়ে গেল যুবক।

চট করে মিসেস জনস্টনের পেছনে আড়াল নিল জ্যাকি। তিনি একটা হাত তুললেন বাইকঅলাকে বাধা দিতে। যুবক এক ঘুষিতে বৃদ্ধাকে মাটিতে শুইয়ে দিতে পারত। সে হাতও তুলল মারার ভঙ্গিতে কিন্তু গ্র্যানির দিকে চোখ পড়তে নামিয়ে নিল হাত।

'নাথান!' সিড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে ডাক দিলেন মিসেস জনস্টন। 'শেরিফকে ফোন করো। এক্ষুণি ওকে এখানে চলে আসতে বলো।'

'আমি বরং ওকে কাঁথা-বালিশ নিয়ে আসতে বলি,' ফোন করতে করতে বলল নাথান। 'আজ রাতে এতবার ওকে আসতে হয়েছে, এখানে বাকি রাতটা কাটিয়ে দিলেই পারে।'

'আপনি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলেন,' বলে উঠল অ্যানি। 'আপনার মোটর বাইকে করে।'

বাইকার বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অ্যানির দিকে যেন ভূত দেখছে। 'তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি কোন অপরাধ করিনি, মিস।'

'তোমাকে নাথান বাড়ি নিয়ে এসেছে, সোনা,' বললেন নানী। 'মনে পড়ছে না?'

হতবুদ্ধি দেখাল অ্যানিকে।

'আজ সন্ধ্যায় তোমাকে দেখি আমি,' বলল বাইকঅলা। 'অন্তত: ভেবেছি তুমি। রাস্তা দিয়ে ছুটে আসছিলে। এই-' জ্যাকির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে, কঠিন কোন সম্বোধন করার মত শব্দ না পেয়ে বলল-'এই ছোড়া তোমার পিছু নিয়েছিল, সঙ্গে ছিল তার ভাই।'

'তাহলে ওটা ছিল এমি?' বলল অ্যানি। 'মাঝে মাঝে আমি গুলিয়ে ফেলি। আপনি এমিকে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল বাইকার। 'এমি উইলিয়ামস। গত বছর এ সময় বৃষ্টির মধ্যে তাকে বাড়ি পৌঁছে দিই আমি। এই ছেলেগুলোই সেদিন ওকে ধাওয়া করেছিল।'

দরজার বাজু ধরে দাঁড়িয়ে তাকা কেসি একথা শুনে হাঁপিয়ে ওঠার মত শব্দ করল যেন কেউ তার বুকে লাথি মেরেছে।

বাইকঅলা তার দিকে ফিরল, এই প্রথম মহিলাকে লক্ষ্য করল সে। 'আমি একেই খুঁজছিলাম।' বলল সে। 'আপনার ছোট্ট মেয়েটি কেমন আছে?'

মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল কেসি, মুখ থেকে সরে গেছে রক্ত। মন্থর গতিতে একটি হাত তুলে মুখ ঢাকল সে। বড় বড় ফোঁটায় চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

কথা বলল অ্যানি।

'এমি মারা গেছে,' বলল ও। সবার চোখ ওর দিকে ঘুরে গেল। 'আমি একটু শেরিফের সঙ্গে কথা বলতে চাই। একা।'

অ্যানি বিছানায় বসে গরম চকোলেট আর বিস্কিট খাচ্ছে। ওর পেটে এতক্ষণ কোন দানাপানি পড়েনি বলেই হয়তো রাক্ষুসে খিদে লেগেছে। নানী ওকে কুমড়োর পাই খেতে আবার সাধাসাধি করছিলেন কিন্তু ও না বলে দিয়েছে-জিনিসটা সত্যি অপছন্দ ওর-তবে এই ফাঁকে নানীর কাছে আগের খারাপ আচরণের জন্য ক্ষমা চাইবার সুযোগ হয়ে গিয়েছিল ওর। বুকের একটা ভার নেমে গেছে অ্যানির। আরেকটা চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে শেরিফকে বলে দিয়ে যে কোথায় খুঁজলে সন্ধান মিলবে এমির লাশের।

আধঘন্টার ঘটনাবহুল একটি সময় ছিল ওটা।

একদল সহকারী নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিল জোনাস। তাদের সাহায্যে প্রবল

আপত্তি সত্ত্বেও জেসি ইবসেনকে আবার পাঠানো হয়েছে জেলে। জ্যাকি গ্র্যাডিও খুব আপত্তি করছিল কিন্তু তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেয়া হয় তার বাবার কাছে। একমাত্র মিসেস উইলিয়ামস বিনা ওজর-আপত্তিতে ফিরে যায় বিছানায়। তারপর শেরিফ ব্যস্ত হয়ে পড়ে ডুবুরি ভাড়া, অ্যাম্বুলেন্সের আয়োজন এবং ডা. ব্রাউনকে খবর দিতে।

অ্যানির নিরাপত্তার জন্য, যাতে আর কেউ অনুপ্রবেশের সুযোগ না পায় সেজন্য জানালায় ডাবল-লকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ মুহূর্তে নানী লুজানে তাঁর মেয়েকে ফোন করে সমস্ত খবরাখবর জানাচ্ছেন।

সন্ধ্যায় সময় মাকে ফোন করে কী বলেছিল মনে পড়তে মুখে হাসির রেখা ফুটল অ্যানির। নাহ্, হ্যালোউইন ডে'টা তার একেবারে নিরামিষ কাটেনি।

ওকে ভূতে পেয়েছিল, হামলার শিকার হয়েছিল, প্রায় ডুবে মারা যাচ্ছিল, দম বন্ধ হয়ে পটল তোলার জোগাড় করেছিল, একটা ভূতের সঙ্গে গিয়েছিল ট্রিক অর ট্রিট খেলতে এবং একটা লাশ পেয়েছে।

তবে যে রহস্যের এখনো সমাধান করতে পারেনি অ্যানি তা হল কীভাবে মারা গিয়েছিল এমি।

ওকে লেকের পানিতে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল কে? যমজ দুই ভাই? বাইকঅলা? তার পাষণ্ড বাপ? নাকি অ্যানির মত পা পিছলে পানিতে পড়ে গিয়েছিল ও? বান্ধবীকে সরাসরি জিজ্ঞেস করতে পারলে ভালো হত।

বান্ধবী? এসব কী বলছে সে? এমি তো ভূত।

তবে এমিকে নিয়ে কোন নেতিবাচক চিন্তা করতে পারছে না অ্যানি। মৃত একজন মানুষকে নিয়ে হ্যালোউইন পালনের বিষয়টি মনে করলেই আত্মা খাঁচাছাড়া হবার কথা। কিন্তু সেরকম কোন অনুভূতি হচ্ছে না অ্যানির। পুরো ঘটনাটাই কেমন বাস্তব আর স্বাভাবিক ছিল। শুধু হিমশীতল শরীর ছাড়া এমিকে আর সবার মতই স্বাভাবিক মনে হয়েছে অ্যানির। ওর শরীর ভেদ করে তো আর সে কিছু দেখতে পারছিল না। শুধু অস্বস্তিকর ব্যাপার একটাই ছিল- অ্যানির মাথার ভেতর এমি যখন-তখন ঢুকে পড়ত আর বেরুত। এটুকুই ওকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে।

জানালার দিকে তাকাল অ্যানি। গাল বেয়ে এক ফোঁটা জল পড়ল। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যে ওরা একে অন্যের কাছাকাছি চলে এসেছিল। দু'জন মানুষ একা থাকলে বোধহয় এরকমই হয়। আমেরিকায় আসার পরে অ্যানির কোন বন্ধু হয়নি। এমি মৃত হোক বা জীবিত, তার সঙ্গ পেতে, কথা বলতে যে অ্যানির ভাল লেগেছে সেটাই আসল কথা। এবং সত্য কথা এটাই যে সে ওকে মিস করবে... ও যে-ই হোক।

জ্যাকি এবং জো বসে বসে মাথায় প্রায় মাথা ঠেকিয়ে মতলব ভাজছে। অ্যানির কারণে তাদের বাবা তাদেরকে হুমকি দিয়েছেন তাদেরকে মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়ে দেবেন। ওখানে গেলে জীবন কয়লা।

'মেয়েটাকে শাস্তি দিতেই হবে।' বলল জ্যাকি। 'ভবিষ্যতে যেন আর উচ্চবাচ্য করতে না পারে সেজন্য ওর মুখটা বন্ধ রাখা দরকার।'

'কী দরকার?' জো বলল। 'তো সোমবার ওর স্কুলে ফিরেই যাচ্ছে।'

'তাই বলে এমনি এমনি ছেড়ে দেব?' বলল জ্যাকি। 'ওকে শায়েস্তা করবোই।'

'তোমাদের কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না, ছেলেরা?'

ঘরের কিনার থেকে ভেসে এসেছে কণ্ঠটি। শোনামাত্র গলার স্বরের মালিককে চিনতে পেরেছে ওরা। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব...

শব্দের উৎসের দিকে ঘাড় ফেরাল এক যমজ ভাই।

টপ বাঙ্কে বসে আছে এমি উইলিয়ামস। সরু কাঠির কাঠি পা জোড়া দোলাচ্ছে। ভয়ে জবান বন্ধ হয়ে গেল দুই ভাইয়ের, একজন অপরজনকে জড়িয়ে ধরল।

'কী ছেলেরা, চুপ মেরে গেলে যে?' খলখলে গলায় হেসে উঠল এমি। 'তোমাদের জন্য একটি খবর আছে। আর একটি উপদেশ। খবরটি হলো অ্যানি কোথাও যাচ্ছে না, এখানেই থাকবে। আর তোমরা যদি ওর সঙ্গে লাগতে যাও, তাহলে আমার কাছে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।'

'কিন্তু তু...তুমি তো...মা...মা...' তোতালাচ্ছে জো।

'মারা গেছি?' ওর অসমাপ্ত বাক্যটি সমাপ্ত করল এমি। 'তাতে কী?'

আবার হাসল সে, এবারে তার মুখমণ্ডল চওড়া হতে শুরু করল, মুখের দুই কোণ বিস্তৃত হতে হতে কানের পাশে গিয়ে ঠেকল। তারপর খুলি আর চোখের কোটরের ভেতর থেকে কিলবিল করে বেরিয়ে আসতে লাগল পোকা। পোকাগুলো ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে, ঘাড়ে, ওর সুতির জামায়, ধীরে ধীরে ওর শরীর গলে যেতে শুরু করল, সবুজ চকচকে আঠালো একটি পদার্থে পরিণত হচ্ছে গায়ের মাংস, পচা শরীর থেকে ভয়ানক বিকট গন্ধ আসছে। আঠালো মাংসপিণ্ড গলে গিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরতে লাগল বিছানার চাদরে এবং মেঝেয়। সবুজ তরলটা ফ্লোরবোর্ডের ফাটলে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে অপার্থিব, ভৌতিক একটি কণ্ঠ প্রতিধ্বনি তুলল ঘরে।

'তোমাদেরকে কিন্তু সাবধান করে দিয়ে গেলাম।'

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিতে লাগল জো এবং জ্যাকি।

সতেরো

অ্যানিকে বিছানা থেকে নামতে গ্র্যানি মানা করায় মি. বুলিঙ্গারকেই অকুস্থলে যেতে হলো যেখানে তিনি ওকে পানিতে ভাসতে দেখেছিলেন। কুমির আকারের কাঠের গুঁড়িটি যথাস্থানে ভাসছিল। তার পাশে নলখাগড়ার জঙ্গলের ধারে বুড়বুড়ি কাটছিল এমি উইলিয়ামসের কংকাল।

লেকের ধারে ডা. ব্রাউনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে শেরিফ দেখছিল তোলা হচ্ছে এমির

কংকাল, তারপর থলিতে পুরে অপেক্ষমান অ্যাম্বুলেন্সে ঢোকানো হলো। চলে গেল অ্যাম্বুলেন্স।

'আমি আগামীকালকের পত্রিকাগুলোর হেডিং এখনই দেখতে পাচ্ছি,' বলল সে। 'হেডলাইনে ঘোষণা করা হচ্ছে 'স্টিলওয়াটার কাউন্টির অদক্ষ পুলিশ।'

'কিন্তু আপনি তো লেক চষে ফেলেছিলেন?' বললেন ডা. ব্রাউন।

'তিনবার ডুবুরি নামিয়েছিলাম লেকে। তবে অ্যানি বলছে এমির গলার সোনার চেইন সমতে লকেটটি কাঠের গুঁড়ির সঙ্গে আটকে গিয়েছিল। ফলে ওর লাশ ভেসে উঠতে পারেনি। মুহূর্তে চেইনটা খোলা হলো, ওর কংকাল বোতলের ছিপি খোলার মত ভেসে উঠল সারফেসে।'

'আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির জবাব কী?'

'এমি উইলিয়ামস পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল নাকি তাকে কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় পানিতে, তাই তো?'

মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার।

'অ্যানি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল,' ক্লান্ত গলায় বলল শেরিফ। 'এমিও হয়তো তাই। তবে সত্যটি হয়তো আমরা কোনদিনই জানতে পারব না। কে অ্যানিকে শ্বাসরোধ করে মারতে চেয়েছিল সে রহস্যও আমি উদ্ঘাটন করতে পারিনি। ইবসেন বলছে কাজটা জ্যাকির। জ্যাকি দুষছে ইবসেনকে। দু'জনেই বলছে তারা অপরজনকে গাছ বেয়ে জানালা দিয়ে অ্যানির ঘরে ঢুকতে দেখেছে। তবে বাইকঅলাকে আমি সন্দেহের কাতারে রাখতে চাই না।'

'কিন্তু একটা বাচ্চা ছেলের পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব?'

'এক্সকিউজ মি, শেরিফ। আমাকে কি আর আপনার প্রয়োজন আছে?' জোনাসের জামার আস্তিন ধরে টান দিলেন মি. বুলিঙ্গার। তাঁকে ভয়ানক বিধ্বস্ত লাগছে।

'আজ আর প্রয়োজন হবে না, মি. বি। তবে তদন্তের স্বার্থে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য আপনাকে দরকার হবে। আপনি কিন্তু শহরের বাইরে কোথাও যাবেন না।'

'আমার যাবার জায়গা থাকলে তো যাব?' হু হু করে বয়ে যাওয়া ঠাণ্ডা বাতাসের কামড় থেকে বাঁচতে কলার টেনে দিলেন বুলিঙ্গার। পা বাড়ালেন অন্ধকারে। তার সঙ্গে চলল হিহি করে কাঁপতে থাকা বুচ।

'ওই যমজ ভাই দুটো সুবিধের না,' মি. বুলিঙ্গারের অপসৃয়মান দেহের দিকে সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়ে রইল শেরিফ। 'গ্র্যাডি ভাইদের কাণ্ড-কীর্তির কথা শুনলে আপনার গায়ের রোম খাড়া হয়ে যাবে।' বলে চলল সে। 'ক্রুশবিদ্ধ সেই বিড়ালটির কথা মনে আছে? আর মিসেস ডগলাসের খামারের মুরগিগুলো? সবগুলোর গলা কাটা ছিল। সবই দুই ভাইয়ের নিষ্ঠুরতার সাক্ষী।' হাত নেড়ে স্মৃতিটি যেন মুছে ফেলতে চাইল শেরিফ।

'আর বিলি?'

'কী জানি! তবে মনে হয় মদের ঘোরে সে উল্টোপাল্টা বকে বেশি।'

'তারমানে সে আপনার সন্দেহের তালিকা থেকে মুক্ত?'

'আমি তা বলিনি। বাইকার যদি সত্যি কথা বলে থাকে এবং এমিকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে থাকে তাহলে ধারণা করি ডাল মে কুছ কালা হ্যায়।'

'তবে সেরকম শক্ত কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায় নি।'

'তা বটে,' সায় দিল জোনাস।

'কেসি কিছু বলেনি?'

'জানেনই তো কেসি তার স্বামীকে যমের মত ডরায়। বেচারী। ওকে জানানো দরকার তার মেয়ের লাশ আমরা খুঁজে পেয়েছি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পেট্রলকারের দিকে পা বাড়াল জোনাস।

'আসলে এ লাইনে আসাই আমার উচিত হয়নি,' বলল সে। 'বাবার কথা শুনে দাঁতের ডাক্তারী পেশা বেছে নিলেই বরং ভালো করতাম।'

শক্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে কেসি উইলিয়ামস, মুষ্ঠিবদ্ধ হাত, নিস্পলক দৃষ্টি ছাতের দিকে। অবশেষে সেই সময় এসে উপস্থিত। যে সময়টি আসবে বলে সে এতদিন ভয় পেয়ে এসেছে।

ডা. ব্রাউন ওকে যে পরিমাণ সিডেটিভ দিয়েছেন তাতে কোন কাজই হয়নি। ঘুম আসছে না কেসির। সে বলতে পারে ওটা একটা দুর্ঘটনা ছিল, এমি পা পিছলে অ্যানির মতই পড়ে গিয়েছিল লেকের পানিতে। কিন্তু তাতে রায় চলে যাবে বাইকঅলার বিরুদ্ধে। যখন চরম সত্য বলার সময় আসবে তখন একজনের অপরাধ আরেকজন নির্দোষ মানুষের কাঁধের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না কেসি।

নির্জন লাউঞ্জে বসে আছেন মি. বুলিঙ্গার। বুচ তাঁর কোলে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। বুলিঙ্গার ভিডিওতে গতবছরের স্কুল কনসার্ট দেখছেন।

ভিডিওতে এমি উইলিয়ামসকে দেখা যাচ্ছে। গোলাপি সুতির ফ্রক পরে নাচছে। ঘন্টাখানেক আগে যে কংকালটিকে লেক থেকে তোলা হলো সেরকম সরু সরু হাড্ডিসার পা নিয়ে নেচে চলেছে এমি।

বেচারী এমি। জীবনে খুব কম মানুষের কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েছিল সে। লোকের মনোযোগ আর্কষর্ণের জন্য কী প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ছিল মেয়েটার!

নৃত্যশিল্পী হতে চেয়েছিল এমি। কেউ ওকে একবার নাচতে বললেই এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে নাচ শুরু করত। স্বপ্ন দেখত স্কুলের সেরা নৃত্যশিল্পী হবে। কিন্তু বেচারীর তেমন প্রতিভা ছিল না। স্কুলের নৃত্য প্রতিযোগিতার অডিশনে যে এমি টিকতে পারেনি সেই কষ্টকর ঘোষণাটি মি. বুলিঙ্গারকেই দিতে হয়েছিল। শুনে এমি এমন ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল মি. বুলিঙ্গারের দিকে যে তিনি হতচকিত হয়ে যান। অবশ্য

কাউকে বাদ দেয়া বা নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মি. বুলিঙ্গারেরই ছিল।

বেচারী, অবহেলিত এমি। অন্য কেউ হলে প্রতিযোগিতায় বাদ পড়ার দুঃখে কেঁদে বুক ভাসাত। কিন্তু এমি ছিল অন্য ধাঁচের মেয়ে। হালকা শরীরের মেয়েটির গা কাঁপছিল প্রচণ্ড রাগে। চলে যাবার আগে যে বিবমিষা নিয়ে এমি তার দিকে তাকিয়ে ছিল, যে কথাগুলো বলেছিল অন্তরের বিষ ঢেলে সে স্মৃতি জীবনে বিস্মৃত হবেন না মি. বুলিঙ্গার।

'এজন্য আপনাকে ভুগতে হবে।'

কেঁপে উঠে থেমে গেল ভিডিও। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মি. বুলিঙ্গার আদর করে বুচের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বেচারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী এমি। নিজে কিছু করে দেখানোর ব্যাপারে এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল সে। পারিপার্শ্বিকতা অগ্রাহ্য করে ওপরে উঠতে চেয়েছিল। চেয়েছিল একটা কিছু হবে।

কিন্তু হায়! কিছুই হতে পারল না সে।

জানালায় জোরে কে যেন টোকা মারল। কে? ট্রিক অর ট্রিটারদের কেউ হতে পারে না। ঘড়ি দেখলেন মি. বুলিঙ্গার। এত রাতে কোন পোলাপান আসবে না তাঁর বাসায়। আর যদি আসেও দরজায় না দিয়ে জানালায় টোকা মারা কেন?

রিমোট টিপে ভিডিও বন্ধ করলেন মি. বুলিঙ্গার, বুচকে কোলে নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগোলেন জানালার দিকে। তাঁর বাতের ব্যথাটা আজ খুব বেশি বেড়েছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলেন।

বাগানে ঘুরে ঘুরে নাচছে এমি উইলিয়ামস। যেন ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে একটি পাতা বারবার পাক খেয়ে চলেছে।

শিক্ষক ওর দিকে তাকিয়ে আছেন বুঝতে পেরে নাচ বন্ধ করে জানালার দিকে তাকাল এমি। তার মাথার ভেজা চুলগুলো শুঁড়ের মতো কিলবিল করছে, মুখের ওপর এসে পড়েছে। চুলের ফাঁক দিয়ে ভয়াল দৃষ্টিতে মি. বুলিঙ্গারের চোখে চোখ রাখল এমি। বীভৎস একটা হাসি ফুটল তার মুখে, কুচকুচে কালো জিভ বের করে ভেংচি কাটল।

ভুল দেখছেন মি. বুলিঙ্গার। নিশ্চয় চোখে ভ্রম দেখছেন তিনি। তবে ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা বুচ ভয়ার্ত সুরে আর্তনাদ করে বুঝিয়ে দিল তিনি যা দেখছেন তা মোটেই চোখের ভ্রম নয়।

কাশতে শুরু করলেন মি. বুলিঙ্গার। কাশতে কাশতে শরীর বাঁকা হয়ে গেল, ফুসফুস বাতাস শূন্য হয়ে এল, হাত দিয়ে বুক চেপে ধরলেন তিনি কুকুরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে। বুচ কুঁইকুঁই করতে করতে টিভির পেছনে আত্মগোপন করল।

বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছেন মি. বুলিঙ্গার, ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ল বাম হাতে, ইস্পাতের একটা সাঁড়াশি যেন শক্ত করে চেপে ধরতে লাগল তাঁর বুকের খাঁচা, চাপ দিয়ে ভেঙে ফেলছে পাঁজর, ফুসফুসের অক্সিজেন সাপ্লাই বন্ধ করে দিচ্ছে। সামনের দিকে হুমড়ি খেলেন মি. বুলিঙ্গার, আঁকড়ে ধরলেন জানালার ভারী মখমল পর্দা, তাঁর

শরীরের ভার সইতে না পেরে পড়পড় করে ছিঁড়তে লাগল পর্দা, টানের চোটে রেলিং ছিটকে এসে তাঁর গায়ে আছড়ে পড়ল।

মেঝেতে পড়ে গেলেন মি. বুলিঙ্গার। কোটরের মধ্যে আতংকে বনবন করে ঘুরছে চক্ষু। তীব্র যন্ত্রণায় মোচড় খেতে লাগল শরীর, শেষে তীব্র একটা খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেলেন তিনি।

ডোরবেলের আওয়াজে চমকে গিয়ে জেগে গেল অ্যানি। ও ঝিমুচ্ছিল, পুরোপুরি ঘুমের রাজ্যে চলে যেতে ভয় পাচ্ছিল যদি আবার দুঃস্বপ্নগুলো দেখতে হয়!

গ্র্যানি যাবার সময় ওর বেডরুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলেন। দরজা এখন ভেজানো, লক্ষ্য করল অ্যানি। মিসেস উইলিয়ামস দরজার বাজুতে হেলান দিয়ে আছে, অদ্ভুত একটা ভাব ফুটে আছে চেহারায়। কান্নাকাটির ফলে তার চোখ লাল, তাকিয়ে আছে অ্যানির দিকে। যেন প্রশ্নের জবাব খুঁজছে যেসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই ওর।

'কেসি,' নানী কখন ওপরতলায় এসেছেন কে জানে, ওরা দু'জনের কেউই টের পায়নি, একটা হাত রাখলেন মিসেস উইলিয়ামসের বাহুতে। 'শেরিফ এসেছে। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। চলো, নিচে যাই।'

দুই মহিলা ঘর বেরিয়ে যাবার পরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বালিশে মুখ গুঁজল অ্যানি। মিসেস উইলিয়ামসের নির্নিমেষ, কঠোর চাউনি তার শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। ও এই প্রথম লক্ষ করেছে এমির সঙ্গে মহিলার চেহারার অনেক মিল। নিচতলা থেকে মানুষজনের আবছা কথা ভেসে আসছে, এক মহিলার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল ও।

ওরা নিশ্চয় লাশটি খুঁজে পেয়েছে।

নিজের ডুবে যাওয়ার সেই আতংকঘন দৃশ্যটি মনে পড়তে শিউরে উঠল অ্যানি। বুকের মধ্যে কী ভয়ানক চাপ, বাতাসের জন্য হাঁসফাঁস, মনে হচ্ছিল খুলি ফেটে বেরিয়ে যাবে চোখ আর মগজ।

বেচারী এমি। কে ওকে অমনভাবে মারল?

জানালার দিকে ঘুরল অ্যানি।

উইলো গাছের ডালে বসে আছে এমি। মরা মানুষের মত।

বিবর্ণ, ফ্যাকাসে মুখ, কবরের মত একাকী, নিঃসঙ্গ। ছোট্ট মাথায় ভেজা শুঁড়ের মত লেপ্টে রয়েছে চুল। বড়বড় চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বেডরুমের দিকে। অ্যানি দ্রুত লেপের নিচে ঢুকে পড়ল।

কলজেটা এসে ঠেকেছে অ্যানির। বুঝতে পারছে না চিৎকার দেবে নাকি স্বাগত জানাবে এমিকে।

যখন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে উঠল অ্যানির, রক্তশূন্য ঠোঁটজোড়া খুলে গেল এমির, শুধু একটি বাক্য উচ্চারণ করল সে : আমি কি ভেতরে আসতে পারি?

আঠারো

পা টিপেটিপে দরজার কাছে গেল অ্যানি। শক্ত করে বন্ধ করল। তারপর ফিরে এল জানালায়। খুলে দিল ছিটকিনি। ধড়াশ ধড়াশ করছে কলজে। এমি শুধু ওকে 'ধন্যবাদ' বলে জানালার চৌকাঠ পেরিয়ে এমনভাবে ঘরে ঢুকল যেন এরচেয়ে সহজ এবং স্বাভাবিক কাজ আর নেই।

'তোমার মা নীচতলায় আছেন,' জানালা বন্ধ করতে করতে বলল অ্যানি। এমি ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে একটা শীতল দমকা হাওয়াও প্রবেশ করেছে। 'কাঁদছেন তিনি।'

'ওরা তাহলে লেকে গিয়েছিল?' এমির চেহারায় কোন ভাবান্তর নেই। বিছানায় বলল ও, খাটে চাপড় দিয়ে ওর পাশে বসতে ইঙ্গিত করল অ্যানিকে।

এমির হুকুম তামিল করল অ্যানি তবে মাঝখানে বেশ খানিকটা ফাঁক রেখে বসল। এমিকে এখন সত্যি একটা কংকালের মত লাগছে দেখতে।

'আমার দিকে ওভাবে তাকিয়ো না,' বলল এমি। 'আমি তোমাকে কামড়ে দেবো না।'

অ্যানি এবারে এমির খানিকটা কাছ ঘেঁষে বসল।

'কাজটা কে করেছিল, এমি?' জিজ্ঞেস কলল ও, ভয়কে ছাপিয়ে গেল কৌতূহল।

'কে কী করেছে?'

এমি ঝুঁকে অ্যানির হাতটা তুলে নিল নিজের হাতে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওর দিকে। শিউরে ওঠা থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল অ্যানি।

'তুমি তো জানো,' পুরোটা আর মুখে বলল না ও।

'আমি এ নিয়ে কোন কথা বলতে চাই না,' বলল এমি।

'কেন নয়?' চেঁচিয়ে উঠল অ্যানি। 'ওদেরকে এমনি এমনি ছেড়ে দেবে?'

তির্যক দৃষ্টিতে ওর দিকে চাইল এমি।

'যমজ দুই ভাইয়ের কাজ ছিল ওটা, না?' অ্যানি প্রসঙ্গটি বাদ দিতে চায় না। 'যমজদের যে কোন একজন। অপরজন তাকে কাভার দিচ্ছে, ঠিক?'

ঠোঁট কামড়ে ধরল এমি, ডানে-বামে মাথা নাড়ল।

'তাহলে কে? নিশ্চয় ওরাই। জ্যাকি আমাকে বালিশ চাপা দিয়ে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, জানো? গাছ বেয়ে উঠে ঘরে ঢুকেছে। তখন আমি ঘুমাচ্ছিলাম।' ঘটনাটা মনে পড়তেই গায়ের রোম খাড়া হয়ে গেল অ্যানির।

'তুমি কী করে জানো ওটা জ্যাকি ছিল?' এমি তার মুখটেপা হাসি হাসল।

'ওটা বাইকঅলা হবে না। সে তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। সে তোমাকে যখন বাড়ি নিয়ে আসে তখন ডজ গাড়িটি ড্রাইভওয়ে...'

বিলি উইলিয়ামসের হাতজোড়া কাঁধের ওপর চেপে বসেছে, লোকটার মুখ দিয়ে ভকভক করে বেরুচ্ছে মদের গন্ধ, ওকে ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর চিৎকার করে বলছে 'তোমাকে আমি মজা দেখিয়ে ছাড়ব,' সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল অ্যানির। সেই সাথে মনে পড়ল এমির বলা কথাটা 'বাবা খুব মারে।'

'আমি জানি তোমার এ দশার জন্য দায়ী কে,' বলল অ্যানি। 'তোমার বাবা।'

বিলি উইলিয়ামস তা সরু বাঙ্কে শুয়ে আছে। পাশের সেলে লেদার জ্যাকেট পরা যুবক নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। লোকটিকে ওরা যখন হাজতে পুরে দেয় তখন নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করছিল সে, শপথ করে বলছিল সে এমিকে শুধু বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল, কোন বদ মতলব তার ছিল না।

বিলি হাত-পা গুটিয়ে ভ্রুণের আকার নিয়ে শুয়ে আছে বাঙ্কে, পিঠ ফেরানো জানালার দিকে যেখানে সে দেখেছে...যা-ই দেখুক দেখেছে। পেটের মধ্যে অসহ্য ব্যথা বিলির। একটা ড্রিংকের জন্য আই-ঢাই করছে মন। কিন্তু চাইলেই কেউ ওকে মদ এনে দেবে না। ডা. ব্রাউন বলেছেন অতিরিক্ত মদ্য পানের কারণে সে চোখে হ্যালুসিনেশন দেখেছে।

যদি তা-ই হয় তো তা-ই হোক।

বিলির মনে হচ্ছে ওর পেছনে জানালাটা বিকট অন্ধকার হাঁ-এর মত ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, রূপান্তরিত হচ্ছে খোলা কবরে, ওকে গিলে খেতে চাইছে। একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে খিঁচুনি ধরে গেছে বিলির শরীরে। কিন্তু পাশ ফিরে শুতে ডর লাগে। কারণ সে জানে ওটা হ্যালুসিনেশন ছিল না।

ও তাকে দেখেছে। এমি ওখানে ছিল।

কিন্তু ওর তো থাকার কথা নয়। তবু সে ছিল। ফিরে এসেছে প্রতিশোধ নিতে।

বেপরোয়া জীবনযাপনে অভ্যস্ত বিলি জীবনে এই প্রথম ভয় পেল। প্রচণ্ড ভয়।

'কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান কোরো না,' বলল এমি, চড়ে যাচ্ছে মেজাজ। 'বললাম না এ বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলতে চাই না। আর শুনেই বা কী লাভ তোমার?'

'তুমি আমার বন্ধু।' বলল অ্যানি। 'বন্ধুদের সবসময় একসঙ্গে থাকা উচিত। আমি চাই না অপরাধী শাস্তি ভোগ না করে ছাড়া পাক। তাহলে ওরা আবার এটা করবে। এখানে বাস করাটা নিরাপদ নয়।'

'তোমার কোন বিপদ হবে না,' ক্রমে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে এমি। 'আমাকে এ নিয়ে আর বিরক্ত কোরো না। আমি এটা নিয়ে কথা বলা দূরে থাক ভাবতে চাই না পর্যন্ত।'

হাত দিয়ে মুখ ঢাকল এমি, যেন মুছে ফেরতে চাইছে স্মৃতি, সামনে-পেছনে দুলতে শুরু করল। একটু পরে ওর আরেকটু কাছে সরে এল অ্যানি, হাত দিয়ে জড়িয়ে

ধরল সরু কাঁধ।

'ঠিক আছে,' বলল অ্যানি। 'বাদ দাও। প্রসঙ্গটি তোলার জন্য আমি দুঃখিত।'

'আমার খুব শীত লাগছে, অ্যানি। খুব ভয় লাগছে। পুরো জিনিসটা আমি আমার মাথা থেকে বের করে দিতে চাই।'

'চিন্তা কোরো না' ওকে আলিঙ্গন করল অ্যানি। 'তোমার জীবনে কোন খারাপ কিছু ঘটতে দেবো না আমি।'

রাগের ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ফেলল এমি। 'কিন্তু সেজন্য দেরী হয়ে গেছে অনেক।'

'দুঃখিত,' বলল অ্যানি। 'আমি ভাবছিলাম যে লোকটা তোমার এ অবস্থার জন্য দায়ী তাকে যদি ধরতে পারতাম তাহলে...তুমি জানো...শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারতে।'

শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল এমির, অ্যানির কাছ থেকে সরে গেল, ভয়ঙ্কর চোখে তাকাল ওর দিকে। 'তোমাকে কে বলেছে আমি শান্তিতে বিশ্রাম নিতে চাই?'

অ্যানির মনে হলো দুনিয়াটা হঠাৎ উল্টে গেছে, ঘরটা অদৃশ্য হয়ে যেতে শুরু করেছে। ও চোখ বুজল, এমির কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায়, মেয়েটাকে আর বন্ধুসুলভ মনে হচ্ছে না।

'তোমার কেমন লাগবে যদি একটা বাক্সের মধ্যে আটকে থাকো? অন্ধকারে। মাটির নিচে।'

এমি একেকটা শব্দ উচ্চারণ করছে, অ্যানির সঙ্গে সঙ্গে সেরকম অনুভূতি হচ্ছে। দেখতে পেল ও ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে একটি বাক্সের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। হাত বাড়াতে আঙুলে মখমল কামড়ের দেয়ালের স্পর্শ পেল, শুনল হাতুড়ি দিয়ে পেরেক মারা হচ্ছে। টের পেল ওকে একটা গর্তের মধ্যে নামানো হচ্ছে। তারপর বাক্সের ডালার ওপরে মাটি ছুঁড়ে মারার শব্দ হতে লাগল। গোরখোদকরা মাটি দিয়ে ঢেকে দিচ্ছে কফিন।

'স্টপ ইট!' কেঁদে উঠল অ্যানি। 'এসব কোরো না। তুমি জানো আমি এগুলো কীরকম অপছন্দ করি।'

'তুমি না জানতে চেয়েছো কী ঘটেছিল?' হিমশীতল এমির কণ্ঠ। 'এতোই যদি কৌতূহল, তাহলে দেখাচ্ছি।'

অ্যানি অন্য কিছু চিন্তা করার চেষ্টা করল। ভালো ভালো সুখ স্মৃতির কথা ভাবতে চাইছে। গরমের ছুটি, ক্রিসমাসের উপহার, গ্র্যানি'র মুখ, কিন্তু কিছুই মনে পড়ল না। নিজের ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণই নেই। ওকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছে এমি।

'না,' আকুতি করল অ্যানি। 'অমন কোরো না এমি। আমি আর বিষয়টি নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব না। কে অমন কাজ করেছে তা নিয়ে আর ভাববো না। তুমি চলে যাও! চলে যাও! প্লীজ!'

কিন্তু ততক্ষণে দেরী হয়ে গেছে অনেক।

ঝড়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অ্যানিকে। ও কোন বিছানা দেখতে পাচ্ছে না। এমিকে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু দেখছে আঁধার, শুনছে বৃষ্টির শব্দ আর কেউ হাঁপাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ করে।

ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো অস্বাভাবিক ভারী লাগছে, মাথাটা হেলে রয়েছে পেছন দিকে যেন হারিয়ে ফেলেছে জ্ঞান। মাথা তোলার চেষ্টা করল অ্যানি, দেখবে কে ওকে নিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই শক্তিটুকু শরীরে নেই। ওর ঘাড়টা কি ভেঙে গেল? না, ঘাড় তো ওর নয়, এমির ঘাড়। এটা ওকে মনে রাখতে হবে। নয়তো যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আসবে-কে জানে তখন কী ঘটবে? ওর নিজের জীবন আর এই অদ্ভুত অন্য ভুবনের বিকল্প সচেতনতার মাঝখানে একটা পার্থক্য বা ফারাক ওকে বজায় রাখতেই হবে। এমির সঙ্গে পুরোপুরি সংযুক্ত হওয়া মোটেই উচিত হবে না।

এমি তো মারা গেছে।

এমিকে যে বহন করে নিয়ে চলছিল সে নলখাগড়ার বনের পাশে এসে দাঁড়াল, উবু হলো, তারপর ওকে শুইয়ে দিল ঘাসের ওপর, মুখটা ফেরানো থাকল পানির দিকে।

সেই কাঠের গুঁড়িটা, কুমিরের মত দেখতে গুঁড়িটা। আতংকিত হয়ে উঠল অ্যানি। এমন বাস্তব লাগছে সবকিছু। ভেজা ঘাসের পানিতে ভিজে যাচ্ছে ওর পরনের কাপড় এবং কার্ডিগান। ওকে এসব থামাতে হবে। বাধা দিতে হবে। ও জানে কী চলেছে।

হঠাৎ একটা চিন্তা মাথায় এল। ও যদি গড়িয়ে চিৎ হয়ে শোয় তাহলে হত্যাকারীর চেহারাটা দেখতে পাবে, ও যদি পালাবার চেষ্টা করে? তাহলে কি এমির নিয়তির পরিবর্তন ঘটবে? ও কি তার বান্ধবীর জীবন বাঁচাতে পারবে?

রহস্যময় খুনীর চেহারা দেখার জন্য মাথা তোলার চেষ্টা করল অ্যানি। কিন্তু একটা পেশিও নাড়াতে পারল না।

জেগে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করল অ্যানি, এই সমান্তরাল বা প্যারালাল পৃথিবী থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

'এমি,' চিৎকার দিল ও। 'এমি আমার মাথা থেকে বেরিয়ে যাও।'

কিন্তু এমি অন্য কোথাও আছে। অ্যানির শরীরের ভেতরে আছে সে। সুস্থ এবং নিরাপদ। এখন যদি সে মারা যায় তাহলে কি অ্যানি অথবা এমি অথবা দুজনেরই চিরবিদায় ঘটবে?

ও টের পেল একজোড়া হাত ওর পিঠে চাপ দিচ্ছে, ওকে ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে পানিতে। ধাক্কার চোটে গড়িয়ে পড়ে গেল অ্যানি, ঝপাস করে পড়ল পানিতে। ডুবতে শুরু করল। পানি গ্রাস করে নিচ্ছে ওর মাথা, হাত বাড়িয়ে কাঠের গুড়িটা চেপে ধরল অ্যানি। ঠিক যেভাবে ধরেছিল এমি।

গলার লকেটটা গুঁড়ির গা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা একটা ডালে আটকে গেল। ওটাকে

ছাঁড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে অ্যানি, জোরে জোরে পা ছুঁড়ছে, ফেনা উঠে গেল পানিতে, আশা করল এবারের গল্পের শেষটা ভিন্নরকম হবে।

কিন্তু তা হলো না।

ফুসফুসের বাতাস বের করে দিয়ে ওখানে গলগল করে ঢুকে গেল পানি, উন্মত্তের মতো হাত-পা ছোঁড়ার গতি হ্রাস পেল, স্লো মোশন ছবির মত ওর শরীরটা গুঁড়ির নিচে পিছলে যাচ্ছে, অন্তিম চেষ্টাটা করল ও, প্রাণপণে শেষবারের মত মাথাটা তুলল পানির ওপরে, লেকের সারফেসের ওপর, শূন্যে ঝুলে থাকা ওর খুনীর ভীষণ চেহারাটা দেখল এক ঝলক।

তারপর লেকের পানি আবার গ্রাস করল ওকে, তীব্র স্রোতের শব্দ এল কানে এবং আঁধার হয়ে এল দুনিয়া।

উনিশ

মিসেস জনস্টনের সবচেয়ে ভালো আরাম কেদারাটিতে বসে আছে কেসি উইলিয়ামস। মুখ ঢেকে রেখেছে রুমালে, সরু কাঁধ জোড়া কুঁচকে আছে। থেকে থেকে ফোঁপাচ্ছে। কাঁদছে সে।

তার বিপরীতে বসে আছে শেরিফ জোনাস, অপেক্ষা করছে কান্না থামার জন্য। মার্থা জনস্টন দোর গোড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। শেরিফ মৃদু মাথা ঝাঁকাল। এর মানে হলো সে এখন কেসির সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চায়। চলে গেলেন মিসেস জনস্টন।

শেরিফ তার শার্টের ব্রেস্ট পকেটের বোতাম খুলে একটি কলম এবং নোটবুক বের করে গলা খাঁকারী দিল।

'জানি, সময়টা তোমার অনুকূলে নয়, কেসি,' বলল সে। 'তবে অনুমতি দিলে তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'কী বিষয়ে?'

'কিছু জিনিস জানতে চাই আমি। তারপর জেলখানায় যাবো বিলির সঙ্গে কথা বলতে।'

স্বামীর নাম শুনেই আবার কান্না শুরু করে দিল কেসি, এবারে রীতিমত হেঁচকি উঠতে লাগল।

'গত দু'বছর ধুরে ওই বাড়িতে কী ঘটছে সব কথাই আমার জানা,' নিরুদ্বেগ সুরে বলল শেরিফ। 'তবে লিখিত কোন অভিযোগ পাইনি বলে আমি কোন অ্যাকশনেও যেতে পারিনি।'

'ক-ক-কীসের অভিযোগ?'

নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে কেসি উইলিয়ামস। তাকে চোখ মুছবার সময়

দিল শেরিফ, রুমাল দিয়ে নাকও মুছে নিল সে।

'আমি জানি ওকে তুমি যমের মত ডরাও, কেসি। তার কারণও নিশ্চয় আছে। তবে ও আর এ মুহূর্তে এখানে নেই।'

চারপাশে ভীতচকিত দৃষ্টিতে তাকাল কেসি, যেন তার স্বামী দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছে, এখনই হালুম করে ঝাঁপিয়ে পড়বে ঘাড়ের ওপর।

'এসব থেকে মুক্তি পাবার এখনই সুযোগ,' বলল জোনাস। 'ও জেলখানায় বন্দী। আমি যা সন্দেহ করছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে সে আর জীবনেও ওখান থেকে বেরুতে পারবে না।'

কেসির চক্ষু আবার অশ্রুসজল হয়ে উঠল, সে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

'ওই মোটরসাইকেল চালক কসম খেয়ে বলেছে সে এমিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। আদালতেও সে শপথ করে কথাটা বলবে বলেছে। বলেছে তুমি সেদিন দরজা খুলে দিয়েছিলে।'

অপরপক্ষ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে সামনে ঝুকল জোনাস, আস্থা দেয়ার ভঙ্গিতে কেসির হাতে হাত রাখল। লাফিয়ে উঠল কেসি যেন বিছার কামড় খেয়েছে। দ্রুত হাত সরিয়ে নিল শেরিফ।

'এমি সেদিন আবার বাইরে গিয়েছিল?' জানতে চাইল সে।

'একা যায়নি,' খুবই আস্তে জবাব দিল কেসি।

'বাইকার বলেছে সে যখন এমিকে নিয়ে আসে তোমাদের গাড়িটি ড্রাইভওয়েতে পার্ক করা ছিল। তার মানে সেদিন বাড়ি ছিল বিলি।'

মাথা দোলাল কেসি, হাতের মধ্যে মোচড়াচ্ছে রুমাল।

'তুমি ওকে আর রক্ষা করতে পারবে না,' স্পষ্ট গলায় বলল শেরিফ। 'গুড গ্রিফ, কেসি, আমরা এমিকে নিয়ে কথা বলছি। বলো। কাজটা কি বিলির? বিলি কি তার নিজের মেয়েকে খুন করেছে?'

আবারও কোন জবাব নেই।

'বলো আমাকে,' বলল শেরিফ। 'কথা দিচ্ছি ও আর তোমার গায়ে হাত তুলতে পারবে না।'

মুখ তুলে চাইল কেসি উইলিয়ামস, জোনাসের বাম কাঁধের পেছনে চলে গেছে দৃষ্টি। ধূসর মুখখানা কেমন সবুজ হয়ে উঠল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে খসে পড়ল রুমাল। ধীর গতিতে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল সে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে ভীত শিশুর চোখে তাকাল, যেন শিশুটি একটি হরর মুভি দেখছে যদিও সে ওটা দেখতে চাইছে না।

ঘাড় ঘোরাল জোনাস। দেখতে চাইছে কাকে দেখে এরকম প্রতিক্রিয়া মহিলার।

গোলাপী পাজামা পরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে অ্যানি। কিন্তু ওটা কী অ্যানি? মুখটা কেমন গলে যাচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে যেন বদলাচ্ছে চেহারা, এই একরকম চেহারা দেখাল, পরক্ষণে অন্যরকম। ভুতুড়ে একটা ইফেক্ট। যেন হলোগ্রাফিক ইমেজ দেখছে

ওরা। অ্যানি আর এমির মিলিত চেহারার ছবি।

'অ্যানি,' ডাকল জোনাস।

এমির গলার স্বর ভেসে এল।

'ঠিক আছে, মা,' বলল সে। 'আমি জানি তুমি ইচ্ছে করে কাজটা করোনি।'

অক্ষিকোটরে তার চোখের মণি বনবন করে ঘুরতে লাগল, শেষে শুধু সাদা অংশটা দেখা গেল, কালো মণি অদৃশ্য। হাঁটুজোড়া ভাঁজ হয়ে গেল, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল গোঙানির আওয়াজ, দড়াম করে পড়ে গেল সে ফায়ারপ্লেসের পাশে।

তার মাথা বাড়ি গেল মেঝেয়, ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেগুনি ধোঁয়া বেরিয়ে এল, যেন বোতল থেকে উদ্ধার পাওয়া এক জিন দৈত্য, অদৃশ্য হয়ে গেল চিমনির মধ্যে।

বিশ

লিভিংরুমের মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় নিজেকে আবিস্কার করল অ্যানি। তার মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে কয়েকটি উদ্বিগ্ন মুখ। চলে গেছে এমি। বুকটা কেমন যেন খালি খালি লাগছে অ্যানির। তবে একই সঙ্গে স্বস্তিবোধও করছে। অ্যানিকে শক্তহাতে নিয়ন্ত্রণ করছিল এমি। আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসতে পেরেছে বলে এমির প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করছে অ্যানি।

তবে অ্যানি বুঝতে পারছে না হঠাৎ করেই তার বান্ধবীটি কেন চলে গেল। এমন সময় ম্যাণ্টেলপিসের ঘড়িটি ঢংঢং শব্দে জানিয়ে দিল রাত বারোটা বেজে গেছে। আর একই সঙ্গে জবাব পেয়ে গেল ও।

হ্যালোউইন ডে শেষ। ভূত প্রেতরা সবাই আবার যে যার কবরে ফিরে গেছে। ভয়ংকর রাতটিরও অবসান ঘটেছে।

হয়তো অ্যানি এখন থেকে নিজের জীবনটাকে নিজের মত করে চালাতে পারবে...

'ওর জ্ঞান ফিরছে,' নানীর গলা।

'সবাই সরো,' বলল জোনাস। 'একটু বাতাস আসতে দাও।'

নাথান এবং সে মিলে অ্যানিকে সোফায় শুইয়ে দিল। গ্র্যানি মা মুরগির মত কক কক করেই চলেছে, মিসেস উইলিয়ামস মাঝেমাঝেই পেছন ফিরে দেখছে না জানি কোন্ প্রেতাত্মা এসে অকস্মাৎ হাজির হয়ে যায়!

সিধে হলো জোনাস। 'সেই শরবতটা আর আছে, নাথান? থাকলে দাও। খেয়ে একটু চাঙা হই।'

'আমি কিছু কথা বলতে চাই,' অবশেষে মুখে রা ফুটল কেসি উইলিয়ামসের।

'আমরা কী চলে যাব?' মার্থা তাকালেন জোনাসের দিকে।

'ব্যাপারটা নির্ভর করছে কেসির ওপর।

'থাকতে চাইলে থাকুন।' মিসেস উইলিয়ামস ধপাস করে বসে পড়ল। 'সবাই তো আজ হোক কাল হোক ব্যাপারটা জানবেই।'

'ওই বাইকঅলা সত্যি কথাই বলেছিল,' শুরু করল সে। একঘেয়ে সুরে কথা বলছে, অ্যানির মুখের ওপর থেকে একবারের জন্যও সরছে না চোখ। 'ও এমিকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। খুব খারাপ অবস্থা ছিল আমার মেয়ের। চুপচুপে ভেজা। ছড়ে গেছে গায়ের চামড়া। রক্ত বেরুচ্ছিল। বাইকার বলেছিল সে ওকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু তার কথা বিশ্বাস করিনি আমি। এমির জামাকাপড় ছিল ছেঁড়া, দুটো পায়েই ছড়ে যাওয়ার চিহ্ন...' চুপ হয়ে গেল সে, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে কান্নায়।

উঠে বসল অ্যানি, আরাম কেদারার সামনে এসে দুঃখী মহিলার কাঁধে হাত রাখল। এমির মা আবার শুরু করল কাঁপা গলায়।

'ওর বাবা ছিল ওপরতলায়। মাতাল। বেহুঁশ। জানতাম এমিকে ওই অবস্থায় দেখলে পিটিয়েই মেরে ফেলবে সে। আমাকেও ধরে মারবে। এর আগে বাবা-মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। মেয়েকে তার ঘরে তালা মেরে রেখেছিল বাবা। আমি এমিকে তালা খুলে দিই। ভেবেছি ঘন্টাখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে বাড়ি ফিরবে এমি।'

মাথা সটান করে তাকাল কেসি, যেন নিজের বক্তব্যের পক্ষে সকলের সম্মতি চাইছে।

'হ্যালোউইনে কোন মেয়েকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রাখা খুবই অন্যায়। ও ডান্সস্কুলে তখন অডিশনেও টিকতে পারেনি। খুবই মন খারাপ ছিল মেয়েটার। ভেবেছি বাইরে থেকে ঘুরে এলে ভাল হয়ে যাবে ওর মন। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও যখন বাড়ি ফিরল না এমি, পাগলের মত হয়ে যাই আমি। বারবার মনে হচ্ছিল ও বোধহয় পালিয়ে গেছে।'

'আপনি পুলিশে খবর দেননি কেন?'

'ফোন করতে যাচ্ছিলাম, এমনসময় বাইকার ওকে বাড়ি নিয়ে আসে। তখন আমার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা ছিল বিলি টের পাবার আগেই কী করে ওকে ওপরে নিয়ে গিয়ে সাফসুতরো করব।'

অ্যানির দিকে তাকিয়ে প্রাণহীন হাসি হাসল কেসি উইলিয়ামস।

'আমরা দোতলায় প্রায় উঠেই গিয়েছিলাম,' বলল সে। 'সিঁড়ির একদম ওপরের ধাপে চলে এসেছি এমন সময় টের পেলাম ঘুম ভেঙেছে বিলির। সে ডিনার খাওয়ার জন্য চেঁচামেচি করছিল। আমি ভয়ানক আতংকিত হয়ে পড়ি। আমি আমার পেছনে দাঁড়ানো এমিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাইছিলাম যাতে ওকে দেখে না ফেলে বিলি। কিন্তু সিঁড়ির ছেঁড়া কার্পেটে পা বেঁধে যায় এমির।' বিলাপের মত শোনাল মিসেস উইলিয়ামসের কণ্ঠ। 'পড়ে যায় ও...সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়তে থাকে...দুম দুম দুম। একদম সিঁড়ির শেষ মাথায় গিয়ে ছিটকে পড়ে ও, মাথাটা সজোরে ঠুকে যায় মেঝেতে, ভয়ংকর এবং বিশ্রী একটা শব্দ হয় মট্ করে। হাত-পা

ছড়িয়ে ওখানে পড়ে থাকে আমার মেয়ে। ভাঙা একটা পুতুলের মত। একটা মরা জিনিসের মত।'

কাঁদতে শুরু করল মিসেস উইলিয়ামস। অ্যানির বুকে মাথা রাখল কাঁদতে কাঁদতে। অ্যানি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। শেরিফ তার নোটবুক নামিয়ে রেখে নাথানের দিকে তাকাল। সে সাইডবোর্ডে গিয়ে একটা গ্লাসে অনেকখানি মদ ঢালল। গ্লাসটি দিল জোনাসকে, সে ওটা কেসির হাতে তুলে দিল। এক চুমুকে ড্রিংকটা শেষ করল ক্রন্দসী নারী।

জোনাস জিজ্ঞেস করল, 'ওকে তুমি লেকে ফেলে দিতে গেলে কেন, কেসি?'

নিষ্ঠুর, নির্দয় একটা প্রশ্ন। প্রশ্নটা কেসির কাশি থামিয়ে দিল।

'বুঝতে পারছিলাম না কী করা উচিত আমার,' নাক টানল সে। 'ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। শুনতে পাচ্ছিলাম বিলি ল্যান্ডিং-এ চলে আসছে।'

'খাইছে!' সশব্দে শ্বাস টানল নাথান।

'আমার মাথায় তখন একটাই চিন্তা এমিকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ওকে লুকিয়ে ফেলতে হবে। আমি ওকে টানতে টানতে গাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলি। বিলি আমাকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখেছিল তবে জানত না এমি গাড়ির পেছনে আছে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঘুষি দেখায় সে। তখন অঝোরধারায় বৃষ্টি হচ্ছে।'

গভীর দম নিল কেসি, স্মৃতিচারণ করছে। 'তারপর যখন আমি ফিরে এলাম বাড়িতে...ওকে বললাম এমিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না তাই ওকে খুঁজতে গিয়েছিলাম। একথা বলেও আমি বিলির মারের হাত থেকে রক্ষা পাইনি। ও খুব চিন্তা করছিল। এমিকে ও খুব ভালবাসত। মেয়েকে খুঁজে পাইনি শুনে রেগে গিয়ে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিলি।'

'কিন্তু লেক কেন?' জিজ্ঞেস করলেন মার্থা। 'ওকে রাস্তার পাশে কোথাও রেখে আসতে?'

'তা-ই উচিত ছিল। কিন্তু বললাম না আমার মাথা তখন ঠিক কাজ করছিল না।' মুখ তুলে চাইল কেসি, ওর তখনকার অবস্থাটা যেন সবাই বুঝতে পারে এজন্য অনুনয়ের সুরে যোগ করল, 'আমি ভেবেছিলাম ওকে লেকে দেখতে পেলে সবাই ভাববে পা পিছলে পানিতে পড়ে গিয়েছিল এমি, তারপর ডুবে মরেছে। একটা মারাত্মক দুর্ঘটনা ছিল ওটা। আমি চাইনি লোকে ভাবুক এজন্য দায়ী বিলি।'

'কিন্তু আমরা তো তখন ওর লাশ খুঁজে পাইনি,' বলল জোনাস।

'পাননি বলে আমিও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শুনেছি জলে ডোবা মরা নাকি তিনদিন পরেই ভেসে ওঠে পানিতে। কিন্তু ওর লাশ ভেসে ওঠেনি বলে আমি উন্মাদ হয়ে যাই। বারবার মনে হচ্ছিল অন্ধকারে, ঠাণ্ডা পানির মধ্যে ডুবে আছে এমির লাশ। ও অন্ধকার একদম সইতে পারত না। ঘরের বাতি জ্বালিয়ে ঘুমাত। বেচারী মেয়ে আমার।'

'ও কাঠের গুঁড়ির নিচে আটকা পড়ে গিয়েছিল,' জানাল জোনাস। 'গলার লকেটটা আটকে গিয়েছিল।'

কানে হাত চাপা দিল কেসি যেন ভয়ঙ্কর সত্যটা শুনতে চায় না। 'ওই লকেটটা ওর খুব পছন্দের জিনিস ছিল। ওর ভেতরে আমার একটা ছবি ছিল। ও ওই ছবি দেখে যেন আমাকে কাছে পেত।'

অ্যানি আলিঙ্গন করল ক্রন্দনরত মহিলাকে। একবার ভাবল যমজদের কথাটা বলে দেয় মিসেস উইলিয়ামসকে। পরে বদলাল সিদ্ধান্ত। যমজভাইদের কথা ও এখন বলবে না, পরে। তবে আরেকটি গোপন কথা কিছুতেই ফাঁস করবে না অ্যানি। জানাবে না যে কেসি যখন তার মেয়ের দেহটা গড়িয়ে ফেলে দেয় তখনো বেঁচে ছিল এমি, তবে জ্ঞান ছিল না। কেসি যদি মেয়েকে নিয়ে জোনাস কিংবা ডা. ব্রাউনের কাছে যেত তাহলে আজ বেঁচে থাকত এমি, এ গল্পটা হয়তো সে নিজেই সবাইকে শোনাত।

টাইলস বসানো সিঁড়ি বেয়ে সবুজ বেজমেন্টে নেমে এলেন ডা. ব্রাউন। এটি শহরের মর্গ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। হ্যালোউইনের এ রাতে এই ভূতুড়ে জায়গায় আসার কোন ইচ্ছাই ছিল না ডাক্তারের। কিন্তু প্রয়োজন বলে কথা।

এমি উইলিয়ামসকে হিমশীতল একটি কিউবিকলের অন্ধকারে পুরে রাখা হয়েছে। আন্ডারটেকার ওর কফিন নিয়ে গিয়ে আরও অন্ধকার কবরে কবর দেবে।

একজন অ্যাটেনডেন্ট এমির কংকাল বোঝাই ব্যাগটি একটি স্লটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করল। ডাক্তারকে একটি ক্লিপবোর্ড এগিয়ে দিল সই করার জন্য।

'ঠিক আছে, পিট,' ডাক্তার ফর্মে সই করে দিলেন। 'তুমি এখন বাড়ি যেতে পারো। আমি সব বন্ধ করে আসছি।'

লোকটি চলে গেল। ডাক্তার ব্রাউন আরও কিছুক্ষণ মর্গে রইলেন কারণ বেচারী মেয়েটিকে অন্ধকারে রেখে যেতে সায় দিচ্ছিল না মন। বেশ কিছুক্ষণ পরে ঘড়ি দেখলেন তিনি। এখন ঘুমাতে যাওয়া দরকার। তিনি লাশ রাখার স্লটের ধাতব দরজায় চাপড় দিলেন যেন অসুস্থ কোন শিশুর মাথায় আদর করছেন। 'ঘুমাও, এমি।' বললেন তিনি। তারপর নিভিয়ে দিলেন বাতি।

ঠিক তখন তাঁর মনে হলো স্লটের ভেতরে খলখল সুরে চাপা গলায় কে যেন হেসে উঠল এবং কেউ অথবা কিছু একটা অন্ধকারে তাঁর পাশ ঘেঁষে ছুটে গেল।

একুশ

'এখন ঘুমাতে যাও। এক রাতের জন্য যথেষ্ট উত্তেজনার খোরক পেয়েছ।'

'আচ্ছা, গ্র্যানি।'

অ্যানি হলুদ লেপের তলায় ঢুকে পড়ল, হট ওয়াটার বটলের রোমশ কভারে

পায়ের আঙুল ঘষতে ঘষতে থুতনি পর্যন্ত টেনে দিল চাদর।

'আরাম লাগছে?'

ঘুম ঘুম চোখে মাথা ঝাঁকাল অ্যানি। আর চোখ মেলে রাখতে পারছে না। খুব অদ্ভুত কেটেছে এবারের হ্যালোউইন'টা। অবশেষে ওটার সমাপ্তি ঘটেছে। এখন গা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিতে পারবে ও। আশা করল এমিও পারবে।

গ্র্যানির কাঁধের ওপর দিয়ে জানালা এবং উইলো গাছের দিকে তাকাল অ্যানি। কোন অনিসন্ধিৎসু মুখ উঁকি মারছে না দেখে স্বস্তিবোধ করল। অবশ্য এমি আসবে বলে আশাও করছে না ও। আসল অপরাধী ধরা পড়ে গেছে, রহস্যেরও সমাধান হয়েছে। এমির আবার হাজির হবার কোনই দরকার নেই।

কিন্তু এমি কোথায় এই চিন্তাটা মাথার মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে অ্যানির। সম্ভবত হাসপাতালে নাকি ফিউনারেল পার্লারে? যেখানে লাশ হিমায়িত করে রাখা হয়। যেখানেই এমির কংকালটা রাখা হোক না কেন, অ্যানির ধারণা মেয়েটির আত্মা এখন শান্তিতেই আছে।

ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসছে অ্যানির। গ্র্যানির গা থেকে লিলি ফুলের মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছে। জীবনে এই প্রথম নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ লাগছে ওর। পুরোপুরি সুখি মনে হচ্ছে। স্টিলওয়াটারে সারা জীবন থেকে যেতে মন চাইছে।

ছাদের সোনালী চাঁদটাকে দেখতে দেখতে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল অ্যানি। অনেকদূর থেকে পরিচিত একটি কণ্ঠ কী যেন জিজ্ঞেস করছিল ওকে, প্রচণ্ড ঘুমের তাড়নায় বুঝতে পারল না ও।

মার্থা জনস্টন তাঁর নাতনীকে চুমু খেয়ে শুভরাত্রি জানালেন। তিনি অ্যানির ঘুমন্ত মুখে তাকালেন। একদম মেরী বেথের কিশোরী বেলার চেহারা। মেয়ে এখন তার চেহারা-সুরত বদলে ফেলে নিজেকে অচেনা করে ফেলেছে। কিন্তু তাঁর নাতনী তার মায়ের কৈশোরের চেহারাই পেয়েছে। সেই একই রকম ভোঁতা নাক, ফ্যাকাসে মুখে অসংখ্য ফুটকি।

ঘুমের মধ্যে কী যেন বলল অ্যানি-কুঁচকে গেছে কপাল। ওর মা-ও ঘুমের মধ্যে এরকম করত।

অ্যানির ম্যাড়মেড়ে বাদামী চুলে হাত বুলিয়ে দিলেন মিসেস জনস্টন। চুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল খোলা আকৃতির কান, সেঁটে আছে মাথার সঙ্গে। মেরী বেথের কানও এরকম। তবে সে কানের নানা জায়গায় ফুটো করে সোনার রিং পরেছে কিন্তু অ্যানি ওসব ফ্যাশনের ধারে-কাছেও ঘেঁষেনি।

অ্যানি যেন তাঁর মেয়ের ডুপলগেঞ্জার হয়ে তাঁকে তাড়া করতে এসেছে।

'আমি তোমার মাকে কখনোই খুব বেশি সময় দিতে পারিনি,' ঘুমন্ত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন মিসেস জনস্টন। 'এজন্য ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।'

শেষবারের মত হলুদ লেপে মৃদু চাপড় মেরে জানালার ছিটকিনি ভালভাবে

লাগানো রয়েছে কিনা পরখ করে ওর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি। দরজা বন্ধ করে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে।

পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট কালো মূর্তিটি, এক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রইল জানালার ধারে, শরতের চাঁদের আলোয় তার ছায়াময় আকৃতিটি রহস্যময়ভাবে ফুটে থাকল।

মিসেস জনস্টনের পায়ের আওয়াজ কিচেনে মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল সে, তারপর যেন হাওয়ায় ভেসে চলে এল অ্যানির বিছনার পাশে, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ঘুমন্ত কিশোরীর দিকে।

ধীরে ধীরে সে এগোল অ্যানির কাছে, তার কাঁধ স্পর্শ করল ঠাণ্ডা হাত দিয়ে। শীতল স্পর্শে কেঁপে উঠল অ্যানি তবে ভাঙল না ঘুম।

অবশেষে কথা বলল ওটা, শুকনো গলায় ফিসফিস করল, যেন মরা পাতা মাটিতে ঘষা লেগে খসখস শব্দ তুলল।

'দুঃখিত, মেয়ে,' বলল ওটা। 'অন্য কোনভাবে যদি এটা করা যেত, করতাম আমি। এছাড়া উপায় ছিল না আমার।'

নাথান কোকো তৈরী করছে, মার্থা ঘরে ঢুকলেন। তাঁর সামনে ধূমায়িত একটি মগ রাখল নাথান। তিনি টেবিলে বসলেন।

'ঘুমের ঘোরে কথা বলে ও,' বললেন মিসেস জনস্টন। 'অবিকল ওর মা'র মত।'

মিসেস জনস্টনের বিপরীতে বসল নাথান।

'বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পানীয়তে ছোট্ট একটি চুমুক দিয়ে মগটা নামিয়ে রাখলেন মার্থা। 'দোষটা আমারই,' বললেন তিনি। 'সবকিছুর জন্য আমিই দায়ী। কোনদিন ওর সঙ্গে ভাল করে দুটো কথা বলিনি, ধৈর্য্য ধরে ওর কোন কথা শুনতে চাইনি। সবসময় বকাঝকা করেছি। একবার যখন ও চুলে রং করল, অনেক বকা দিয়েছিলাম। এর পরপরই ও বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। অথচ মেয়েটা আমার ভালোই ছিল। শুধু চাইত ওর প্রতি যেন মনোযোগ দিই।'

'এসবের জন্য এখনো নিজেকে দোষারোপ করে কী হবে?' বলল নাথান। 'ওই সময় তোমার পক্ষে যা যা করা সম্ভব করেছো।'

মাথা নাড়লেন মার্থা।

'ওর জন্য যদি বেশি সময় ব্যয় করতাম, ওর প্রয়োজন মাফিক মনোযোগটুকু যদি দিতাম, ও কখনোই বাড়ি ছেড়ে চলে যেত না। ঝামেলাতেও জড়াত না।'

নাথান নিজের কাপের দিকে তাকাল।

'যদিও এতে আমার মাথা গলানো উচিত হচ্ছে না,' বলল সে। 'তবু জানতে

আগ্রহ হচ্ছে ও কোথায় গিয়েছিল? এই মুহূর্তে ও এখানে ছিল...পরের মুহূর্তে...'

'এক তরুণ ভবঘুরের সঙ্গে মোটর সাইকেলে চড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা ওকে হ্যালোউইন ডে'তে রাস্তা থেকে তুলে নেয়। সানফ্রান্সিসকো গিয়েছিল। ছয় মাস আমার সঙ্গে যোগাযোগই করেনি।'

'তুমি বকাবকি করবে সে ভয়েই হয়তো যোগাযোগ করেনি।'

'আ...হ্যাঁ...হয়তোবা...যখন শুনলাম এক কূটনীতিকে বিয়ে করেছে ও, ভেবেছি নম্র আর ভদ্র-সভ্য হয়ে উঠবে আমার মেয়ে। কিন্তু কই কিছুই তো হলো না। চমৎকার ওই ছেলেটার সঙ্গেও বনিবনা হলো না।'

'তুমি চাইলেই তো আর ওদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে পারতে না।'

'জানি আমি। এখন তো ও অ্যানিকেও যথেষ্ট সময় দেয় না। লুজানে এক লোকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখন। আমার নাতনী মরল কী বাঁচল তাতে কিছুই এসে যায় না ওই লোকের।'

হঠাৎ একটা ভাবনা মাথায় এল মার্থার। তিনি অবাক হলেন এ চিন্তাটা আগে কেন আসল না? তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন বলে উঠল নাথান, 'অ্যানিকে এখানে রেখে দিলেই পারো! পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। স্বাভাবিক মানুষের মত জীবন-যাপন করবে।'

বুদ্ধিটা দারুণ মনে ধরল মার্থার। এমন কিছু করা গেলে সবচেয়ে ভালো হয়। সিদ্ধান্ত নিলেন কাল সকালেই মেয়ের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবেন। তিনি নিশ্চিত মেরী বেথ প্রস্তাবটি পেয়ে খুব খুশি হবে। আর ডন আরও বেশি খুশি হবে কারণ মেফিল্ডের বোর্ডিং স্কুলের অনেক খরচ। তারচেয়ে অ্যানি এখানে থেকে পড়াশোনা করলে তার খরচ প্রায় হবেই না বলা চলে। কিন্তু অ্যানি রাজি হবে তো?

'অ্যানি যদি না থাকতে চায়?' আশংকাটি প্রকাশ করেই ফেললেন মিসেস জনস্টন।

'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।' হাসল নাথান। 'মেফিল্ড স্কুল অ্যানির দু'চক্ষের বিষ।'

'তাহলে বলছ এগিয়ে যেতে?' বললেন মিসেস জনস্টন।

'এরকম সুযোগ দ্বিতীয়বার আসবে না জীবনে,' বলল নাথান। 'তোমার জায়গায় আমি হলে দু'হাতে সুযোগটা আঁকড়ে ধরতাম।'

নিঃসীম আঁধারের মাঝে জেগে গেল অ্যানি। ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে। বাতাসে কীরকম ওষুধ ওষুধ গন্ধ। নাক কোঁচকাল ও, হাত বাড়াল লেপ টেনে খোলা বুক ঢাকতে।

লেপের বদলে হাতে ঠাণ্ডা প্লাস্টিকের মত কী একটা জিনিস ঠেকল। ভাঁজ করা, বড় খামের আকারের। আঙুল দিয়ে আউটলেট খোঁজার চেষ্টা করল অ্যানি। কিন্তু হাতে ঠেকল না কিছু।

হাতের তালু শরীরের ওপর চেপে থাকা ধাতব পদার্থটির গায়ে ঠেকাল ও। সরু একটি মেটাল স্ট্রিপের স্পর্শ পেল আঙুলের ডগা। একটা চেইন। প্লেনে যেসব বড় বড় কাপড়ের ক্যারিয়ার তোলা হয় তাতে এরকম চেইন থাকে।

অন্ধকারে মুচকি হাসল অ্যানি। ও আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তবে এটা একটা অর্থহীণ স্বপ্ন। কারণ ওর মনে হচ্ছে ওকে কেউ প্লাস্টিকের বড় একটা ব্যাগে পুরে চেইন টেনে আটকে দিয়েছে ব্যাগ।

হঠাৎ ভয়ংকর চিন্তাটা মাথায় এল ওর। কিন্তু তা কী করে সম্ভব? ও চিন্তাটা জোর করে মাথা থেকে দূর করে দিল। ও তো আসলে স্বপ্ন দেখছে, তাই না? কাল সকলে যখন ঘুম ভাঙবে, দেখবে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

শেষের সে ভয়ংকর...

পরের দিন ঝকঝকে রোদ নিয়ে উদ্ভাসিত হলো ঝলমলে একটি সকাল। আকাশ পরিস্কার। মেঘশূন্য। পাখিরা মনের আনন্দে গাইতে শুরু করেছে গান।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নাথান। ভাবছে আবহাওয়া যেহেতু ভালো, মার্থার বাগানের আগাছা পরিস্কার করার জন্য চমৎকার মওকা আজ। তার আগে সে মিনিট বিশেক একটু হাঁটাহাঁটি করে আসবে। বারান্দা থেকে নেমে এল নাথান। পা বাড়াল রাস্তায়।

বেশিদূর যেতে পারেনি ও, মি. বুলিঙ্গারের বাড়ির সামনে অ্যাম্বুলেন্স দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটার বোধহয় গতরাতে হার্ট অ্যাটাক-ফ্যাটাক হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানল ওর ধারণাই সত্যি। বেঁচে আছেন মি. বুলিঙ্গার তবে কথা বলার শক্তি হারিয়েছেন। ডাক্তার ব্রাউন জানালেন শিক্ষকটি কথা বলার শক্তি ফিরে পেতে পারেন আবার না-ও পারেন। বললেন বুচ চেঁচামেচি না করলে কেউ নাকি জানতেই পারত না বুলিঙ্গার সাহেব অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন বাড়িতে। সময়মতো ডাক্তার না এলে হয়তো মরেই যেতেন।

শেরিফ এসে হাজির হলো। সে কুকুরটিকে মেবেলিনের কাছে দিয়ে আসবে। বুচকে পুষবার আগ্রহ দেখিয়েছে মেবেলিন। শেরিফের গাড়ির সামনের আসেন কেসি উইলিয়ামসকে বসে থাকতে দেখল নাথান। অবশেষে ঘর থেকে বেরুবার সাহস করতে পেরেছে সে। মেবেলিন তাকে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে বলেছে, সে সঙ্গে তার দোকানে ওয়েট্রেসের চাকরিও তার জন্য পাকা। যাক, মহিলার শেষ পর্যন্ত একটা হিল্লে হলো।

এমির মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত অবশ্যই হবে তবে জোনাস বলেছে করোনার নিশ্চিত। রায় যাবে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর পক্ষে। বাইকার চলে যাবার আগে কথা দিয়েছে সে সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে আবার ফিরে আসবে। কৃতকর্মের স্মৃতি নিয়ে বাকিটা

জীবন কাটাতে হবে কেসিকে, তবে জোনাসের ধারণা ওটাই মহিলার সবচেয়ে বড় শাস্তি। এই মানসিক যন্ত্রণা। নাথানও তার সঙ্গে একমত।

বিলি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। বলেছে স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করবে। নাথান তাকে বলেনি যে খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেছে পাখি। ঘটনা শীঘ্রি জেনে যাবে বিলি, বউকে খুঁজতেও বেরুবে তবে মেবেলিন তাকে কেসির ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেবে কিনা সন্দেহ।

গেটের কাছাকাছি এসেছে নাথান, শন গ্র্যাডির গাড়ির নিচে প্রায় চাপা পড়তে যাচ্ছিল। তিনি ভীত বাদুড়ের মত স্টেশন ওয়াগন নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন গ্যারেজ থেকে। গাড়িভর্তি সুটকেস আর পেছনের সিটে ম্লান মুখে বসে আছে তাঁর দুই যমজ সন্তান।

তাদের মা চোখ মুছতে মুছতে পুত্রধনদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগলেন। নাথান শুনল যমজ ভ্রাতৃদ্বয় মিলিটারি একাডেমিতে যাচ্ছে ভর্তি হতে। তারা নিজেরাই নাকি ওখানে পড়তে চেয়েছে।

গোটা শহরটাতেই যেন পরিবর্তনের একটা আকস্মিক জোয়ার শুরু হয়েছে। নাহ্, এবারের হ্যালোউইনটা সত্যি অসাধারণ ছিল।

মার্থাকে লেটেস্ট খবরগুলো দিতে আর তর সইছিল না নাথানের। সে খিড়কির দুয়ার দিয়ে ভেতরে ঢুকল।

কিন্তু কিচেনে অ্যানি ছাড়া কেউ নেই।

টেবিলে বসে আছে সে, এখনো গোলাপি পাজামা পরা, মস্ত একখণ্ড কুমড়োর পাই গবগব করে খাচ্ছে। তার মুখের নিচে রস লেগে আছে, এমনভাবে ঠেসে ঠেসে মুখে ঢোকাচ্ছে পেস্ট্রি যেন বহুদিন অভুক্ত সে। মুখের খাবারটা পেটের মধ্যে ঠেলে দিল সরাসরি কার্টন থেকে দুধ গিলে।

'তোমার গ্র্যানি কই?' র‍্যাকে কোট রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করল নাথান।

'ফোনে মা'র সঙ্গে কথা বলছে।'

অ্যানি হুমহাম করে খেয়েই যাচ্ছে যেন এর ওপর নির্ভর করছে ওর জীবন।

'তোমার ব্যাপারটা কী বলোতো?' স্লাইস ভর্তি প্লেটের দিকে তাকাল নাথান। 'কুমড়োর পাই না তোমার দু'চক্ষের বিষ?'

ওর দিকে তাকাল মেয়েটা, মুখ টিপে এমন একটা হাসি দিল, কেন জানে না নাথান, ঘাড়ের কাছের সমস্ত চুল সরসর করে দাঁড়িয়ে গেল।

'ধরো আমি আমার অভ্যাস বদলে ফেলেছি,' ঠোঁট উল্টে বলল সে, আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সকালের নাস্তায়।

ভ্যাম্পায়ার
রবার্ট ব্লচ

শ্রমিক দিবসের পর থেকেই হঠাৎ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করল। সামার কটেজের লোকজন ফিরে যেতে লাগল যে যার বাড়ি। লস্ট লেকে জমতে লাগল বরফ। ওখানে সলি ভিনসেন্ট ছাড়া কেউ থাকে না।

ভিনসেন্ট মোটাসোটা মানুষ। বছরখানেক আগে, বসন্তে লেকের পাড়ের বাড়িটি কিনেছে। সারাটা গ্রীস্ম তার কেটেছে স্পোর্টস শার্ট পরে। কেউ কখনো তাকে শিকারে যেতে বা মাছ ধরতে দেখেনি। যদিও প্রতি হপ্তায়, ছুটির দিনে শহর থেকে বন্ধুবান্ধব এনে বাড়িতে বসে ফুর্তিফার্তি করে ভিনসেন্ট। বাড়ি কিনেই সে দরজার সামনে বিরাট এক সাইনবোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে-সনোভা বীচ।

শহরে খুব কম আসত ভিনসেন্ট। একদিন দেখা গেল ডক'স বার-এ ঢুকেছে। তারপর মাঝে মাঝে সে আসতে শুরু করল, ব্যাক রুমে নিয়মিত জুয়াড়িদের সাথে কার্ড খেলল।

পোকারটা ভালই খেলে ভিনসেন্ট। সুগন্ধী, দামী সিগার খায়। কিন্তু নিজের সম্পর্কে বলে না কিছুই। একদিন স্পেকস হেনেসি তাকে সরাসরি একটা প্রশ্ন করে বসলে জানায়, সে এসেছে শিকাগো থেকে। আগে ব্যবসা করত। এখন কিছুই করে না। তবে কিসের ব্যবসা করত জানায়নি ভিনসেন্ট।

ভিনসেন্ট হয়তো মুখে সব সময় তালা দিয়েই রাখত যদি না সেদিন স্পেকস হেনেসি তাকে সোনার মোহরগুলো দেখাত।

'এ জিনিস দেখেছ কেউ কখনো আগে?' জিজ্ঞেস করে হেনেসি তার বন্ধুবান্ধবদের। কেউ কিছু বলে না। তবে ভিনসেন্ট একটা মোহর তুলে নেয় টেবিলের ওপর থেকে।

'জন্মদিনে, তাই না?' বিড়-বিড় করে ভিনসেন্ট। 'দাড়িঅলা লোকটা কে-বিসমার্ক?'

খিক খিক হাসে স্পেকস হেনেসি। 'এবার ধরা খেয়ে গেছ, বন্ধু। ওটা বুড়ো ফ্রাঙ্ক জোসেফের ছবি। অস্টো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের নেতা ছিল, চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। ব্যাঙ্কে এই তথ্যটাই দিয়েছে ওরা আমাকে।'

'কোত্থেকে পেয়েছ এ জিনিস? স্লট মেসিনে?' জানতে চায় ভিনসেন্ট। এদিক-ওদিক মাথা নাড়ে হেনেসি। 'একটা ব্যাগে। বোঝাই ছিল সোনার মোহরে।'

এই প্রথম ভিনসেন্টকে কোন ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে উঠতে দেখে সবাই। মোহরটা আবার হাতে নিয়ে মোটা আঙুলের মধ্যে ঘোরাতে ঘোরাতে জিজ্ঞেস করে, 'ঘটনাটা বলবে আমাকে?'

গল্পবাজ হেনেসির উৎসাহের অভাব নেই। 'খুব অদ্ভুত একটা ব্যাপার।' বলতে শুরু করল সে। 'গত বুধবার অফিসে বসে আছি। এমন সময় এক ভদ্রমহিলা এসে জানতে চাইল আমি রিয়েল এস্টেটের ব্যবসা করি কিনা এবং বিক্রি করার মত কোন লেক প্রপার্টির সন্ধান জানা আছে কিনা আমার। বললাম, অবশ্যই জানা আছে। লস্ট লেকের ধারে শূলজ কটেজটি বিক্রি হবে আসবাবপত্রসহ।

মহিলা জানতে চাইল বাড়িটি দেখানো যাবে কিনা তাকে। বললাম, কোন অসুবিধা নেই। কাল দেখাতে পারব। কিন্তু মহিলা বলল, সে আজ রাতেই বাড়ি দেখতে চায়।

'আমি নিয়ে গেলাম তাকে বাড়ি দেখাতে। বাড়ি দেখে পছন্দ হয়ে গেল তার। বলল কাগজপত্র ঠিক করতে। সে সোমবার রাতে এল এক ব্যাগ বোঝাই মোহর নিয়ে। আমি ব্যাঙ্কের হ্যাঙ্ক ফেলচকে ডেকে এনেছিলাম দেখাতে মোহরগুলো নকল কিনা। সে বলল, সব ঠিক আছে।' খিক-খিক হাসল হেনেসি। 'তখন আমি ফ্রাঙ্ক জোসেফের নামটা জানতে পারি।' ভিনসেন্টের কাছ থেকে মোহরটি নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল সে। 'যা হোক হচ্ছে তুমি নতুন এক প্রতিবেশী পেয়ে যাচ্ছ। শূলজের বাড়ি থেকে তোমার কটেজের দূরত্ব আধা মাইলও না।

ভাল কথা, মহিলার নাম হেলেন এস্টারহেজি। সম্ভবতঃ হাঙ্গেরিয়ান রিফুজি। কাউন্টেস জাতীয় কিছু একটা হবে। হয়তো দেশ পালিয়ে এসেছে। এমন কোথাও লুকিয়ে থাকতে চায়, যেখানে কম্যুানিস্টরা তার খোঁজ পাবে না। তবে আমার অনুমান ভুলও হতে পারে। কারণ মহিলা নিজের সম্পর্কে কিছুই বলেনি।'

'কি পোশাক পরণে ছিল মহিলার?' জিজ্ঞেস করে ভিনসেন্ট।

'লাখ টাকার দামের পোশাক।' হাসে হেনেসি তার দিকে তাকিয়ে।

'কেন ওকে বিয়ে করার চিন্তা করছ নাকি? ওর টাকার জন্য? তবে মহিলাকে দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। কথা বলার ঢং অনেকটা অভিনেত্রী শাশা গেবর-এর মত। চেহারাতেও খানিকটা মিল রয়েছে। তবে মহিলার চুলের রঙ লাল। আমি যদি বিয়ে না করতাম, তাহলে-'

'বাড়িতে কবে উঠছে সে?' বাধা দেয় ভিনসেন্ট।

'বলেনি। তবে দু'একদিনের মধ্যেই হয়তো উঠে যাবে।'

হাই তুলে উঠে দাঁড়ায় ভিনসেন্ট।

'আরে, চললে কোথায়? খেলা মাত্র শুরু হয়েছে-'

'ক্লান্ত লাগছে,' বলল ভিনসেন্ট। 'বাড়ি যাব।'

বাড়ি ফিরে এল ভিনসেন্ট। তবে সে রাতে ঘুম এল না। সারাক্ষণ নতুন প্রতিবেশীর কথা ভাবল।

নতুন একজন প্রতিবেশী পেয়ে খুশি হয়নি ভিনসেন্ট। সে যতই সুন্দরী হোক না কেন। ভিনসেন্ট নিজেও এক ধরনের রিফুজি। উত্তর থেকে পালিয়ে এসেছে। শুধু অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন বন্ধু ছাড়া কারো সাথে যোগাযোগ নেই তার। এদেরকে বিশ্বাস করে সে। এরা ছিল তার ব্যবসার সহকারী। তবে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের চেহারা আর দেখতে চায় না ভিনসেন্ট। কখনো নয়। এদের কেউ কেউ প্রতিহিংসাপরায়ণ। আর ভিনসেন্টের প্রাক্তন ব্যবসায় প্রতিহিংসা ঝামেলার সৃষ্টি করতে পারে।

এসব ভেবে সে রাত ভালভাবে ঘুমাতে পারল না ভিনসেন্ট। তবে বালিশের নিচে তার পুরানো ব্যবসার ছোট একটি স্যুভেনির কেন রেখে দিল সে তা কেউ বলতে পারবে না।

পরদিন ভিনসেন্ট সিদ্ধান্ত নিল তার নতুন প্রতিবেশীর ওপর নজর রাখবে। তার সন্দেহ হচ্ছে মহিলার প্রতি। মহিলা হাঙ্গেরিয়ান উদ্বাস্তু হলেও কে বলতে পারবে তাকে প্ল্যান করে এখানে পাঠানো হয়নি?

সকাল সকাল শহরে গেল ভিনসেন্ট। দামী একজোড়া বিনোকিউলার কিনে নিয়ে এল। তারপর নজর রাখতে শুরু করল শূলজের বাড়ির দিকে।

রান্নাঘরের জানালা দিয়ে শূলজের বাড়ি পরিস্কার দেখা যায়। একটা ছোট ভ্যান নতুন প্রতিবেশীর জিনিসপত্র নিয়ে এল। জিনিস বলতে কতগুলো বাক্স এবং ক্রেট। ভ্যানের লোকজন ধরাধরি করে নামাল বাক্স পেঁটরা। মনে হলো বেশ ভারী। বাক্সের মধ্যে কি মোহর আছে? ভাবল ভিনসেন্ট। অপেক্ষা করতে লাগল বাড়ির নতুন মনিবনী কখন আসে দেখার জন্য। ভ্যান চলে গেল কিন্তু মহিলার দেখা মিলল না। সমস্ত বিকেল বিনোকিউলার চোখে ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে হাত এবং চোখ দুই-ই ব্যথা হয়ে গেল। ভিনসেন্ট বিনোকিউলার রেখে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রান্নায়। খিদে লেগেছে। একটা স্টেক ভাজল সে। খেল। তারপর লেকের পাড়ে তাকাল। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। শূলজের বাড়ির জানালায় জ্বলে উঠেছে আলো। তার মানে মহিলা এসেছে। কখন এল? ভিনসেন্ট যখন রান্নায় ব্যস্ত নিশ্চয় তখন।

আবার বিনোকিউলার চোখে তুলল ভিনসেন্ট। যে দৃশ্য তাতে বিনোকিউলারটি তার হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে যাচ্ছিল।

মহিলার বেডরুমের পর্দা ওঠানো। মহিলা শুয়ে আছে। বিছানায়। গায়ে কিছু নেই। সোনার মোহরে সমস্ত শরীর ঢাকা।

চোখ কচলে আবার বিনোকিউলার অ্যাডজাস্ট করল ভিনসেন্ট। না, ভুল দেখেনি সে। সত্যি মহিলার গা ভর সোনার মোহর, বাতির আলোতে ঝলকাচ্ছে। লাল টকটকে

চুল তার, ডিম্বাকৃতি, মুখখানা বিষণ্ন, বড় বড় চোখ, উঁচু চোয়াল। ঠোঁটজোড়া দেখে মনে হল হাসছে। সোনার মোহরের গায়ে হাত বোলাচ্ছে।

ভিনসেন্ট টের পেল তার গলা শুকিয়ে এসেছে, দপদপ লাফাচ্ছে কপালের একটা শিরা। বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থাকল, ফর্সা মোহরে ঢাকা শরীরটার দিকে। অনেকক্ষণ পরে বিনোকিউলার নামাল ভিনসেন্ট। জানালার পাল্লা বন্ধ করল। তারপর থ মেরে বসে রইল। সে রাতেও ঘুম হলো না তার।

পরদিন সকালে ইলেকট্রিক রেজর দিয়ে দাড়ি কামাল ভিনসেন্ট। লোশন মাখল গায়ে। নতুন টাই পরল। তারপর মুখে চওড়া হাসি নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগোল শূলজের কটেজের দিকে।

কটেজের দরজার নক করল ভিনসেন্ট।

কোন সাড়া নেই।

আবার কড়া নাড়ল ভিনসেন্ট।

কেউ সাড়া দিল না।

ডজনখানেক বার ঘন ঘন কড়া নেড়েও লাভ হলো না কোন। কটেজের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ। ভেতর থেকে কারো সাড়া শব্দ মিলল না।

দরজা ভেঙে ঢুকতে পারে ভিনসেন্ট। মহিলাকে সত্যি কেউ পাঠিয়েছে কিনা জানে না সে। অবশ্য পকেটে ছোট্ট স্যুভেনিরটা আছে তার। যে কোন ঘটনার জন্য প্রস্তুত। মহিলার সোনার মোহর মেরে দেয়ার ইচ্ছে তার নেই। মহিলাকে খুব পছন্দ হয়েছে তার। সত্যিকার কাউন্টেস হবে হয়তো। এমন একটি মেয়েকে বিয়ে করতে পারলে মন্দ হয় না। তবে জোর করে ঢোকা ঠিক হবে না ভেবে ফিরে গেল ভিনসেন্ট। সারাদিনে জানালার ধারে বসে রইল সে। অপেক্ষা করল। মহিলার দেখা মিলল না। সম্ভবতঃ কেনাকাটা করতে শহরে গেছে। তবে ফিরে আসবে। আর ফিরে আসলেই-

এবারও হেলেন কখন বাড়ি ফিরল দেখা হলো না ভিনসেন্টের। ওই সময় সে বাথরুমে ছিল। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাথরুম থেকে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসতেই ভিনসেন্ট দেখতে পেল হেলেনের বাড়িতে আলো জ্বলছে। এবার আর দ্বিধা করল না ভিনসেন্ট। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল হেলেন বাড়িতে। তবে সদর দরজায় কড়া নাড়ার মুহূর্তে একটু ইতস্তত করল। শেষে টোকা দিল দরজায়। দরজা খুলে দিল হেলেন।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হেলেন, চেয়ে আছে অন্ধকারে। বাতির আলো পড়েছে তার লাল চুলে। জ্বলজ্বল করছে। পরনে লম্বা গাউন।

'বলুন।' বিড়বিড় করল হেলেন।

ঢোক গিলল ভিনসেন্ট। মেয়েটা এত সুন্দরী বুঝতে পারেনি। এই মেয়ের সাথে কথা বলতে হবে বুঝে শুনে।

'আমার নাম সলি ভিনসেন্ট,' অবশেষে বলল সে। 'আমি আপনার প্রতিবেশী। লেকের ওধারে থাকি। শুনলাম আপনি নতুন এসেছেন এখানে। তাই পরিচয় করতে এলাম।'

'তো?'

হেলেন তাকিয়ে আছে ভিনসেন্টের দিকে। হাসছে না। অস্বস্তি লাগল ভিনসেন্টের।

'আপনি হেলেন, তাই না? শুনেছি আপনি হাঙ্গেরিয়ান। এদিকে বোধ হয় এই প্রথম এসেছেন। এখানো থিতু হতে পারেননি। আর-'

'আমি এখানে ভালই আছি।' বলল হেলেন। এবারও হাসল না সে, নড়াচড়াও করল না। স্রেফ মূর্তির মত তাকিয়ে আছে। ঠাণ্ডা, কঠিন, সুন্দরী একটি পাষাণ মূর্তি।

'শুনে খুশি হলাম। আপনি আমার বাড়িতে একবার পা দিলে ধন্য হবো। আমার বাড়িতে টোকে ওয়াইন আছে, আছে বড় একটি রেকর্ড প্লেয়ার, বেশ কিছু ক্ল্যাসিক মিউজিকসহ। এমনকি সেই বিখ্যাত সঙ্গীত হাঙ্গেরিয়ান র‍্যাপসডি'র দুর্লভ কালেকশনও রয়েছে আমার কাছে। এ ছাড়া-'

হঠাৎ হেসে উঠল মেয়েটা। হাসির দমকে গোটা শরীর কাঁপছে, কিন্তু বরফ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'নো। থ্যাঙ্কিউ। আমি এখানে ভাল আছি। আমাকে কেউ বিরক্ত না করলেই বরং খুশি হবো।'

'তাহলে অন্য কোনদিন-'

'আবারও বলছি আমি চাই না কেউ আমাকে বিরক্ত করুক। এখন বা অন্য কোন সময়। গুড ইভিনিং মি.-' বলে দড়াম কমে দরজা বন্ধ করে দিল হেলেন।

বেকুব বনে গেল ভিনসেন্ট। তারপর রাগ হলো খুব। তার মুখের ওপর এভাবে দরজা বন্ধ করে দেয়া? কেউ সলি ভিনসেন্টকে অপমান করে পার পায়নি। অতীতে পায়নি, এখনো পাবে না। মেয়েটাকে একটা শিক্ষা দিতেই হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে ভিনসেন্ট কি জিনিস। রাগে ফুলতে ফুলতে বাড়ি ফিরে এল ভিনসেন্ট। এরকম মেয়ে না হলেও তার চলবে। পুরুষ মানুষের টাকা থাকলে বিয়ে করা আবার সমস্যা নাকি?

টাকা! হ্যাঁ, মেয়েটার অনেক টাকা আছে। নিজের চোখে দেখেছে ভিনসেন্ট। নিশ্চয়ই ওই ক্রেটগুলো বোঝাই মোহরে। হেলেন ক্রেটের ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে মোহর, কম্যুনিস্টদের ভয়ে। কম্যুনিস্টরা জানতে পারলেই মোহরগুলো কেড়ে নেবে। কিন্তু ভিনসেন্ট নিচ্ছে না কেন? কে তাকে সাধু সেজে বসে থাকতে বলেছে? বিশেষ করে এত বড় অপমানের পরেও।

প্ল্যানটা সাথে সাথে মাথায় এল। শহরে গিয়ে কার্নি আর ফ্রমকিনকে খবর দিলেই হলো। ওরা সকল কাজের কাজি। মেয়েটা বাড়িতে একা। তিন মাইলের মধ্য আর কেউ নেই। ঘটনা ঘটার পরে কেউ সন্দেহও করবে না। ভাববে কম্যুনিষ্টরা এসে মেরে রেখে গেছে মেয়েটাকে। যাবার সময় লুট করে নিয়ে গেছে সোনার মোহর।

পরদিন কার্নি আর ফ্রমকিনকে খবর দিল ভিনসেন্ট। বলল, রাত ন'টার মধ্যে বাসায় চলে আসতে। কাজ আছে। সাক্ষাতে বাকি কথা হবে।

কার্নি আর ফ্রমকিন যথাসময়ে হাজির হয়ে গেল ভিনসেন্টের বাড়িতে। ভিনসেন্ট তখনো বিষয়টি নিয়ে ভাবনায় মশগুল। তার চেহারা দেখেই কার্নি বুঝতে পারল কিছু একটা ভজঘট আছে।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল কার্নি।

হাসল ভিনসেন্ট। 'তোমাদের গাড়ি ঠিক আছে তো? কিছু মাল নিয়ে যেতে হবে শহরে।'

'কি মাল?' বলল ফ্রমকিন।

'তা এখন বলা যাবে না। আমি মাল নিয়ে আসব।'

'কোথায় ওটা?'

'মাল আনতেই বেরুচ্ছি।'

ও ফিরে না আসা পর্যন্ত বাড়িতে ওদেরকে বসে থাকতে বলে গেল ভিনসেন্ট। বলল, আধাঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে। তারপর বেরিয়ে পড়ল।

ওদেরকে বলেনি ভিনসেন্ট কোথায় যাচ্ছে। ওরা অনুসরণ করে কিনা বোঝার জন্য বাড়িটাতে বার দুয়েক চক্কর দিল ভিনসেন্ট। কার্নিরা পিছু নেয়নি বোঝার পরে হনহন করে এগোল হেলেন কটেজের দিকে। বেডরুমের জানালায় আলো জ্বলছে। এবার হেলেনকে মজা দেখিয়ে ছাড়বে ভিনসেন্ট। সে কি জিনিস বুঝবে মেয়েটা।

হেলেনের কি দশা করবে মুচকি হাসছিল ভিনসেন্ট। হঠাৎ খেয়াল করল নিভে গেছে বেডরুমের আলো। তার মানে ঘুমাবে হেলেন। ঘুমাবে মোহরের বিছানায়। ভালই হলো। ভিনসেন্টকে কড়া নাড়তে হবে না। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকবে। আঁতকে উঠবে হেলেন।

সদর দরজা ভাঙতে হলো না। খোলাই ছিল। পা টিপে টিপে এগোল ভিনসেন্ট। চাঁদের আলো গলে পড়ছে জানালা দিয়ে। প্রায় পরিস্কার দেখা যাচ্ছে সব কিছু। হঠাৎ গলার কাছটা ভারভার ঠেকল ভিনসেন্টের। খুব বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়লে এমন হয় তার।

বেডরুমের দরজা খুলে ফেলল ভিনসেন্ট। জানালার পর্দা তোলা বলে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত ঘর। আলো পড়েছে বিছানায় শুয়ে থাকা হেলেনের ওপর। তার গা ভর্তি মোহর। চাঁদের আলোয় ঝিলমিল করছে। এমন সময় হেলেনের বরফ-সবুজ চোখজোড়া খুলে গেল। ভিনসেন্টের সাথে চোখাচোখি হলো। সেই ফাঁকা দৃষ্টি চোখে। হঠাৎ অদ্ভুত একটা পরিবর্তন শুরু হয়ে গেল। সবুজ আগুনের মত জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল চোখজোড়া। হাত বাড়িয়ে দিল হেলেন। ডাকছে ওকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল ভিনসেন্ট। হঠাৎ পচা কাদামাটির গন্ধ ভক করে লাগল নাকে। মুহূর্তে চোখের সামনে থেকে নেই হয়ে গেল হেলেন। পরক্ষণে পেছন থেকে একটা ধাক্কা খেল ভিনসেন্ট।

হুমড়ি খেয়ে পড়ল বিছানায়। বিছানা কোথায়? এতো পচা কাদা! উঠে বসতে গেল ভিনসেন্ট, হেলেন চট করে ওর হাত ধরে ফেলল, মুচড়ে নিয়ে গেল পিঠের ওপর। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল ভিনসেন্ট। ধস্তাধস্তি করতে লাগল। মেয়েটার গায়ে কি শক্তি! ওর সাথে কিছুতেই পেরে উঠছে না ভিনসেন্ট। মেয়েটা ঠাণ্ডা, শক্ত কি একটা জিনিস দিয়ে যেন বাড়ি মারল ওকে। আমার পিস্তল, ভাবল ভিনসেন্ট। নিয়ে গেছে পকেট থেকে।

একটু পরে গরম একটা তরল ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল ভিনসেন্টের মুখ বেয়ে। রক্ত! গা গুলিয়ে উঠল মেয়েটা ওর রক্ত চেটে খাচ্ছে দেখে।

হেলেন খাটের সাথে খুব শক্তভাবে বেঁধে ফেলেছে ভিনসেন্টকে। নড়তে পারছে না। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। বাতাসে পচা মাটির গা গোলানো গন্ধ। শুধু বিছানা নয়, মেয়েটার গা থেকেও আসছে। মেয়েটা হাসছে।

'শেষ পর্যন্ত তুমি এলে, অ্যাঁ?' ফিসফিস করে বলল মেয়েটা। 'তোমাকে আসতেই হলো, না? বেশ করেছ এসেছ। এখন থেকে তুমি এখানে থাকবে। আমি তোমাকে আমার পোষ্য করে রেখে দেব। তুমি বেশ মোটাতাজা আছ। গায়ে অনেক রক্ত। তোমাকে দিয়ে অনেক দিন চলে যাবে আমার।'

মেয়েটার মুখ থেকে কথা বলার সময় তীব্র দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে। মুখ সরিয়ে নিল ভিনসেন্ট। আবার হেসে উঠল মেয়েটা।

'এরকম প্ল্যানই করেছিলে তুমি, তাই না? আমি জানি তুমি কেন এসেছ। মোহরের জন্য। সোনার মোহর আর কাদা মাটি নিয়ে এসেছি আমি আমার দেশ থেকে। ওর ওপর সারাদিন ঘুমাই আমি। জেগে উঠি রাতের বেলা। আর রাতে যখন জেগে উঠব তখন তুমি থাকবে এখানে। কেউ আমাদের খোঁজ পাবে না। বিরক্ত করতেও আসবে না। তাগড়া শরীর তোমার। আমার খিদে মিটাবে ভাল ভাবেই।'

ভিনসেন্ট কর্কশ গলায় বলল, 'না। তুমি নিশ্চয়ই আমার সাথে ঠাট্টা করছ। তুমি একটা উদ্বাস্তু-'

আবার হাসল মেয়েটা। 'হ্যাঁ। আমি উদ্বাস্তু। তবে রাজনৈতিক উদ্বাস্তু নই।' জিভ বের করল সে। ভিনসেন্ট তার দাঁত দেখতে পেল। লম্বা, সাদা দাঁত, ঠোঁটের কোণা দিয়ে বেরিয়ে আছে। এগিয়ে এল ভিনসেন্টের ঘাড় লক্ষ্য করে...

ওদিকে ভিনসেন্টের বাড়িতে তার জন্য অপেক্ষায় থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে নিজেদের গাড়িতে উঠে বসেছে কার্নি এবং ফ্রমকিন।

'ও আজ আর আসছে না,' বলল কার্নি। 'মনে হচ্ছে কোন ঝামেলা বাধবে। ওর চেহারায় ঝামেলার আভাস দেখতে পেয়েছি আমি। অদ্ভুত লাগছিল ওকে।'

'ঠিক,' সায় দিল ফ্রমকিন। 'কিছু একটা হয়েছে ভিনসেন্টের। আর কোন ঝামেলা বাধার আগেই কেটে পড়ি চলো।'

নাইট অব নাইটমেয়ারস
লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

আমরা তখন থাকতাম লুডলো নামের এক জায়গায়। দাদু, মানে রেজিনাল্ড ইস্টনও তখন আমাদের সঙ্গেই থাকতেন। যে বাড়িতে আমরা থাকতাম সেটার নাম ছিল ডিনহ্যাম হল। সে আজ থেকে চল্লিশ বছর আগের কথা। যতোদূর মনে পড়ে আঠারোশো নব্বই সাল তখন।

দাদু আমার পাশের ঘরেই থাকতেন। ঘর দুটোর মাঝখানে একটা দরজা ছিল। ইচ্ছে করলে বারান্দা হয়ে না ঢুকেও পাশের ঘরে যাওয়া যেত।

একদিন 'আর্থার! আর্থার!' ডাক শুনে রাতে ঘুম ভেঙে গেল। দাদুর গলা চিনতে পারলাম। বুড়ো মানুষ, ভাবলাম অসুস্থ হয়ে কিনা।

পাশের ঘরে ছুটে গেলাম। দাদু বিছানায় উঠে বসে আছেন। ফ্যাকাসে চেহারা, দেহ কাঁপছে মৃদু মৃদু। অত্যন্ত বিচলিত মনে হচ্ছে তাঁকে।

উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে দাদু?'

'ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল,' কাঁপা গলায় জানালেন দাদু।

'কি স্বপ্ন দেখেছেন?'

'থাক, বাদ দে ওকথা,' চেপে যেতে চাইলেন দাদু।

আমিও তাঁকে চেপেই ধরলাম। 'না; বলো না, দাদু।'

আমার কৌতূহল তীব্র দেখে দাদু তাঁর কাহিনী শুরু করলেন।

'স্বপ্নে দেখলাম আমি স্ট্যাফোর্ডশায়ারের এক বন্ধুর সঙ্গে। বাড়িটার নাম ব্রীড হল। রোদ ঝলমলে এক সকালে ঘুরতে বেরিয়েছি, সবুজ মনোরম পার্কের ভেতর দিয়ে চলেছি গ্রামের প্রাচীন গির্জাটার দিকে। একসময় গির্জার এলাকায় প্রবেশ করলাম। চারধারে সমাধিস্তম্ভ আর সমাধিপ্রস্তর ফলক। ওগুলোর মাঝ দিয়ে যাওয়া পথ ধরে আমি এগিয়ে চললাম, পথ শেষে উঠে পড়লাম গির্জার পুরানো বারান্দায়। ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময়ে গির্জার ঘন্টা বেজে উঠল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ তো মানুষ মারা যাবার কথা জানানোর ঘন্টা। দেখলাম বড়সড় একদল লোক এগিয়ে আসছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কাজ সারতে আসছে লোকগুলো। গির্জার ভেতরে আর ঢুকলাম না আমি, ভাবলাম আনুষ্ঠানিকতা যতক্ষণ চলবে ততক্ষণ আমি বরং

সমাধিপ্রস্তরগুলোই দেখি না বরং। বিরক্তিকর অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার ইচ্ছে হলো না। সমাধিপ্রস্তরের নাম, মৃত্যুর তারিখ আর বয়স দেখতে দেখতেই কেটে যাবে সময়টুকু।

কাছে চলে এসেছে ততক্ষণে শবযাত্রীরা। পুরানো বারান্দার দিকেই আসছে। পৌঁছে গেছে প্রায়। কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস না করে পারলাম না একজনকে। "মারা গিয়েছেন কে?"

না থেমেই জবাব দিল শোকার্ত লোকটা, "মিস্টার মঙ্কটন।"

এবার তাকে থামতে হলো। নামটা পরিচিত মনে হওয়ায় আমি আবার জিজ্ঞেস করেছি, "বলুন তো কোথায় থাকতেন তিনি?"

"সামারফোর্ড হলে," বলে পা বাড়াল লোকটা।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। সামারফোর্ড হলের মঙ্কটন তো আমার বন্ধু! এখান থেকে বেশি দূরে নয় ওর বাড়ি। খারাপ হয়ে গেল মনটা। স্বাভাবিক। হওয়ারই কথা। মঙ্কটন ছিল আমার আশৈশব বন্ধু।

ঠিক করলাম এভাবে খামোকা ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দেব। শবযাত্রীদের সঙ্গে গির্জায় প্রবেশ করলাম, বসলাম পেছনের একটা খালি আসনে।

গির্জার পুবদিকে চ্যান্সেল, স্বাভাবিকভাবেই তার ওপর কফিনটা রাখা হলো। আচার-অনুষ্ঠান বেশিরভাগ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে গেল। এবার আত্মার মুক্তির জন্য প্রার্থনা শেষে কফিন কবরের দিকে রওনা হবে। গির্জার বেঁটে মতো এক কর্মচারী এসময়ে এগিয়ে এলো আমার দিকে। বুড়ো লোক। চেহারাটা এমনই যে গা ঘিনঘিন করে ওঠে। কি যেন অস্বাভাবিকতা আছে মধ্যে। বলল, "যতদূর জানি আপনি মিস্টার মঙ্কটনের সবচেয়ে পুরানো বন্ধু। আপনারই উচিত শবযাত্রার অগ্রভাগে থাকা। শোক মিছিল গির্জার তলার সমাধিক্ষেত্রে যাবে। আপনি রাজি থাকলে আপনাকেই শোক মিছিলের নেতা করা হবে। আপনি রাজি তো?"

কথাগুলো এমনভাবে হলো যে মানা করতে পারলাম না।

মৃতের আত্মিক মুক্তির প্রার্থনা শেষ হয়ে গেল। যাজকের চেহারা দেখে আমার মনে হলো একটা শুকনো আপেলের মুখে প্রার্থনা শুনলাম। সে যাই হোক, এবার শুরু হলো অন্তিমযাত্রা। চারজন লোক কফিনটা কাঁধে তুলে নিল। ওরাই লাশ কবরস্থানে নিয়ে যাবে।

গির্জার সেই বুড়ো লোকটা আবার এগিয়ে এলো আমার দিকে, আমাকে পথ দেখাল। সামনে সামনে যেতে হবে আমাকে।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামতেই মাথা নিচু করতে হলে আমাকে, ছাদটা খুবই নিচু। অস্বস্তিকর। কবরস্থানের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকার সময় শরীর আরও বাঁকাতে হলো। ঢুকে পড়লাম কষ্টেসৃষ্টে।

ভূগর্ভস্থ সমাধির ভেতরে এক জায়গায় উঁচু একটা প্ল্যাটফর্ম। সেটার ওপরই কিছু বিশেষ কফিন রাখা হয়। ওই প্ল্যাটফর্মে মঙ্কটনের পূর্বসুরিদের কফিনও আছে। কোন

কোন কফিনের তক্তা বয়সের ভারে খুলে গেছে, ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। কঙ্কালের অংশ বিশেষ।

কফিনটা নামিয়ে রাখার পর সবাই বেরিয়ে যেতে শুরু করল। আগে আমি ছিলাম দলের সামনে, এবার দলের শেষে। পা বাড়ালাম দরজাটার দিকে। গির্জার সেই বেঁটে কর্মচারী আমার পাশে চলে এলো। হঠাৎ করে আমাকে ধাক্কা মারল শয়তানটা। শবযাত্রী দলের প্রধান হওয়ায় আমাকে যে টর্চটা দেয়া হয়েছিল সেটা ছিটকে কাদাময় ভেজা মাটিতে পড়ে নিভে গেল, কোনমতে তাল সামলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম।

এক ছুটে চলে গেল বদমাশটা। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল সমাধিক্ষেত্র থেকে বের হওয়ার দরজা। ক্লিক করে একটা আওয়াজ হলো। তালা লাগিয়ে আমাকে এখানে আটকে ফেলেছে হারামীটা! আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। ভয়ে আতঙ্কে অস্থির। কঙ্কাল আর লাশগুলোর সঙ্গে আমি এখানে একদম একা! অন্ধকার দরজা লক্ষ্য করে ছুটে গেলাম। ঠকাস করে মাথাটা ঠুকে গেল। দরজার পাল্লায়, দরজায় ধাক্কা দিলাম, চিৎকার শুরু করলাম, সাহায্য চেয়ে। "দরজাটা খুলুন! দরজা খুলুন! আমি ভেতরে আটকা পড়ে গেছি!"

সাড়া দিল না কেউ।

হতাশ হয়ে ধাক্কাধাক্কি বন্ধ করে দিলাম। এক ঘন্টা কেটে গেল সেই গোরস্থানে। অন্ধকার! কি ভীষণ অন্ধকার সেখানে! মনে হলো এক যুগ হলো এখানে আটকা পড়ে আছি। আস্তে আস্তে চোখে আঁধার সয়ে এলো, দেখতে শুরু করলাম। অস্পষ্ট ভাবে দেখতে পেলাম প্ল্যাটফর্মটা। ওটার ওপর কফিনগুলোও দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ একটা আওয়াজে কান ফেটে যাওয়ার জোগাড় হলো এই নীরবতায়। চমকে উঠলাম। কি যেন ভেঙে যাচ্ছে! ফেটে বেরোচ্ছে কি যেন! নাকি কোন দরজা খোলা হচ্ছে?

স্বস্তির পরশ পেলাম বুকে। যাক, শেষ পর্যন্ত কেউ বুঝেছে যে আমি এখানে আটকা পড়েছি। এবার মুক্তি মিলবে।

কিন্তু আমার স্বস্তি বেশিক্ষণ থাকল না। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দরজা খুলছে না, আওয়াজটা আসছে এই মাত্র রেখে যাওয়া কফিনের ভেতর থেকে। ফেটে যাচ্ছে ওটা, তক্তাগুলো খুলে খুলে আসছে! তীক্ষ্ণ চোখে কফিনটার দিকে তাকালাম মাথার চুল দাঁড়িয়ে গেছে আমার তখন। ঠিকই ধরেছি। ওই কফিনটাই! তক্তা ফেটে ফাঁক বড় হচ্ছে! সেই ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করল বুড়ো মঙ্কটনের লাশ! পুরো দেহ, পচা, গলিত, দুর্গন্ধযুক্ত বেরিয়ে আসছে!

বেরিয়ে এসে কফিনটার পাশে দাঁড়াল মুহূর্ত খানেকের জন্য, তারপর পা বাড়াল আমার দিকে। টলোমলো পায়ে আসছে! আমাকে ধরবে!

পাগলের মতো ছুটোছুটি শুরু করলাম, কিছুতেই জীবন্ত ওই মৃতদেহের হাতে মরতে পারব না। বারবার লাশটাকে ফাঁকি দিলাম। কিন্তু কতক্ষণ দম থাকে? এক সময় আমার নাগাদ পেয়ে গেল মঙ্কটনের লাশ।

আতঙ্কে মাটিতে পড়ে গেলাম আমি। লাশটাও হুড়মুড় করে আমার গায়ের ওপর পড়ল। আমার দু'গালে নখ বসাচ্ছে লাশটা। গাল টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। ব্যথায় চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু আতঙ্কে তখন রুদ্ধ হয়ে গেছে আমার গলা, কোন আওয়াজ বের হলো না। ছাড়া পাবার জন্য ঝটকাঝটকি করে বুঝলাম কোন লাভ নেই। জীবন্ত সমাধি তো আগেই হয়েছে, এবার প্রেতের হাতে মৃত্যু ছাড়া আর কোন পথ নেই।

বুক চিরে হঠাৎ বেরিয়ে এলো বিকট আর্তনাদ। আর সেই আর্তনাদেই ঘুম ভেঙে গেল আমার।

ঘুম থেকে উঠে দেখি কবরস্থানের ভেতর নয়, নিজের বিছানায় শুয়ে আছি। সারা শরীর ঘামে ভিজে গিয়েছে। শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে ঘাম শুকিয়েছে। ভয় লাগছিল একা একা, তাই তোকে ডাক দিলাম, যদি সঙ্গে থাকিস তো ভয় কম লাগবে।' একটু আফসোস করেই দাদু বললেন, 'আমার জন্য তোর ঘুম হলো না।'

আমি মাথা নাড়লাম। যে দারুণ গল্প শুনতে পেলাম তার কাছে ঘুম তো সে তুলনায় কিছুই না।

পরদিন দাদুর কাছে খবর এলো, তাঁর বাল্য বন্ধু মিস্টার মঙ্কটন মারা গিয়েছেন। রাতে দাদু যখন দুঃস্বপ্নটা দেখেন তখনই মারা গেছেন মঙ্কটন! খবর এলো সেই স্বপ্নে দেখা গির্জাতেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হয়েছে। দাদুকে করা হয়েছে শোক মিছিলের নেতা।

স্বপ্ন আবার সত্যি হবে না তো!

দ্য লাস্ট রাইড
কার্ল জ্যাকবি

নভেম্বর সন্ধ্যা। তীব্র ঠাণ্ডা বাতাস চাবুক কষাচ্ছে সুউচ্চ পাহাড়গুলোর চুড়োয়। ঝিরঝির তুষার বাইরে, লঝঝরে ভ্যানের মধ্যে বসা জেব ওয়াটারস শীতে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর ভেড়ার চামড়ার কোটের কলার গলা পর্যন্ত টেনে দিল। সারাদিন আজ মুখ গোমড়া করে ছিল আকাশ, পুঞ্জীভূত কালো মেঘের ছড়াছড়ি প্রকৃতিকে করে তুলেছে বিষণ্ন। মেঘের রং এখন ধূসর, অনেকটা নিচে নেমে এসেছে, যেন বরফের পর্দা হয়ে ঝুলে আছে দূরের পাহাড়গুলোর মাথায়। ডানদিকে ইস্টার্ন স্টেটস পাওয়ার লাইনসের সুবিন্যস্ত টাওয়ারের সারি, এইচ জি ওয়েলসের একমাত্র প্রমাণ। ঝড়ো হাওয়ায় কেঁপে উঠছে বৈদ্যুতিক তার। মৃদু গোঙানির আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

গাড়ির জানালা দিয়ে উদ্বিগ্নমুখে আকাশ দেখল জেব ওয়াটারস। 'ফেরার সময় অঢেল ঝামেলা হবে মনে হচ্ছে,' বিড়বিড় করল সে। 'প্রচণ্ড তুষার ঝড় শুরু হতে পারে।'

ইঞ্জিনে আরও গ্যাসোলিন ঢোকাল জেব, শক্তমুঠোয় চেপে ধরল হুইল। হঠাৎ একটা খাড়া বাঁক সাঁৎ করে দৃশ্যমান হলো সামনে। সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে, তবু সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত নগ্ন পাহাড় আর ঢালগুলোতে। মারচেস্টার আরও ত্রিশ মাইল দূরে, সুদীর্ঘ এবং সর্পিল। লিটলটন মাত্র পেছনে ফেলে এসেছে সে। ঝড় হবার যেহেতু যথেষ্ট সম্ভাবনা, কাজেই তার উচিত হবে শহরে ফিরে যাওয়া। কাল সকালে যাত্রা করলেই হলো। এখানে বেহুদা বসে থেকে লাভ নেই, বিশেষ করে যে জিনিস যে ডেলিভারি দিতে যাচ্ছে সেটিকে নিয়ে। ওটার কথা ভাবতেই এই দেখো কেমন শিরশির করে উঠল গা।

মারচেস্টারের লোকসংখ্যা খুবই কম। আর লিটলটনের পর ওটাই কাছে পিঠের একমাত্র শহর। জেব ওয়াটারস সপ্তাহে দুইদিন ওখানে যায় শহরবাসীদের জন্য রসদপত্র নিয়ে। যাত্রীও বহন করে সে। তবে ফিরতি পথে বেশিরভাগ সময় তাকে যাত্রীশূন্য অবস্থায় ফেরত আসতে হয়। আজকের অবস্থা ভিন্ন। আজ খুব জরুরী একটি জিনিস তাকে বহন করতে হচ্ছে। তার ভ্যান গাড়ির পিছনে, কফিনে, শুয়ে আছে

ফিলিপ কার, মারচেস্টারের সবচেয়ে জনপ্রিয় তরুণ। 'রেস কার' নামেই ফিলিপের পরিচিতি ছিল সর্বাধিক। কারণ কার রেসিং-এ তার মত দুর্ধর্ষ ড্রাইভার গোটা শহরে কেউ ছিল না। বছর তিনেক আগে অনেক খেটেখুটে সে একটা গাড়ি তৈরি করেছিল। নাম দিয়েছিল 'স্পীড এমপ্রেস।' ফ্লোরিডার ডেটোনা বীচে ভেল্কি দেখাতে চেয়েছিল ফিলিপ। চেয়েছিল নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করবে। ঘণ্টায় ৩০০ মাইল ছিল তার গাড়ির গতি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য ফিলিপ কারের। প্রতিযোগিতার দিন তার গাড়ির একটা চাকা ছুটে যায়, মুহূর্তে ওটা পরিণত হয় একতাল ইস্পাতে। দুর্ঘটনায় সঙ্গে সঙ্গে মারা যায় ফিলিপ। ফ্লোরিডায় তাকে সমাধিস্থ করার কথা বলা হলেও তার নিজের শহর মারচেস্টারের অধিবাসীরা সবাই প্রতিবাদ জানায়। না, ফিলিপের কবর হবে তার নিজ বাসভূমে। তখন ফ্লোরিডার সবচেয়ে কাছের শহর লিটলটনে নিয়ে আসা হয় ফিলিপের মরদেহ। আর এখন জেব ওয়াটারসের ওপর দায়িত্ব বর্তেছে লাশ মারচেস্টারে পৌঁছে দেয়ার।

কাজটা মোটেও পছন্দ হয়নি জেবের। ভয় পাবার যদিও কিছু নেই, জানে সে, কিন্তু রেন থারপিয়ান হিলসের এই পর্বতের রাজ্যে এসে এখন নিজেকে তার খুব একা মনে হতে লাগল। জায়াগাটা নিজের হাতের তালুর মতই চেনে জেব। তবুও এই সময় একজন সঙ্গী থাকলে খুব ভাল হত, ভাবছে সে। কফিনটার কথা মনে পড়লেই কেমন অস্বস্তি লাগছে তার।

বাতাসের গতি বেড়ে চলল, বৃদ্ধি পেল তুষারপাত। তবে ভ্যানের ক্যাবটা এখনও উষ্ণ। গাড়ির একটা উইন্ডশিল্ড ভাঙা, ফুটোয় কম্বল সেঁটেও কাজ হয়নি কোন, হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছেই।

পাহাড়ের মাথায় ঝুলে থাকা মেঘের মধ্যে থেকেই যেন ঝুপ নেমে এল গাঢ় অন্ধকার, জেব আলো জ্বালল। ওর ভ্যানটা বহু পুরানো, হেডলাইট কাজ করে চুম্বক শক্তিতে। তুষারপাত দ্রুত ঘন হয়ে আসতে জেব বাধ্য হলো স্পীড কমাতে। হেডলাইটের আলো টিমটিমে হয়ে এল, কোনমতে আলোকিত থাকল সামনের রাস্তা।

এ রাস্তার যেন শেষ নেই। তুষার পুঞ্জ হয়ে জমতে শুরু করেছে। পাহাড়ের গা থেকে ঘুর্ণি পাকিয়ে বরফের সাদা পর্দা মিহি তুষার নিয়ে ভ্যানের ফাঁকফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ছে ভেতরে। হু হু করে ঠাণ্ডা বেড়েই চলেছে।

রাস্তার সবচেয়ে খাড়া ঢাল, ফ্রোমস হিল, অস্পষ্টভাবে ফুটে উঠল চোখের সামনে। জেব লক্কর ঝক্কর মোটরটার অ্যাকসেলেরেটর সজোরে দাবিয়ে ধরল পা দিয়ে। ধুঁকতে ধুঁকতে ওপরে উঠতে শুরু করল মান্ধাতা আমলের গাড়ি, পেছনের চাকা দুটো দ্রুত পাক খাচ্ছে বরফে, যেন পিছলে নেমে যাবে। ইঞ্জিনটা তীব্র প্রতিবাদ জানাল। ট্রান্সমিশন গুঙিয়ে উঠল, যেন ভয়ানক ব্যথা পাচ্ছে। ধীরে, ধীরে, ঠেঙাতে ঠেঙাতে বহু কষ্টে ঢালের মাথায় উঠে এ ভ্যান।

'যাক বাবা, বাঁচা গেল'-চিৎকার করে বলল জেব। কিন্তু একটু বেশিই উল্লাস প্রকাশ করে ফেলেছে সে। কারণ হঠাৎই মোটরের আওয়াজ স্তব্ধ হয়ে গেল, নিভে গেল হেডলাইট। চারপাশে বাতাসের গর্জন আর পর্বতমালার ভৌতিক ধূসর অন্ধকার নিয়ে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাক গাড়িটা।

স্রেফ কাঠ হয়ে গেল জেব ওয়াটারস। ভয়ের চোটে কয়েক মুহূর্ত নড়তেই পারল না। একটা লাশ নিয়ে বরফের রাজ্যে বন্দি! সবচেয়ে কাছের শহর এখনও বিশ মাইল দূরে আর সে কিনা এই নিস্তব্ধ পরিবেশে একটা কফিনের সঙ্গে! ভয়ঙ্কর অবস্থাটা অনুধাবন করে কপালে ঠাণ্ডা ঘাম ফুটল জেবের।

কিন্তু ব্যাপারটা কি ছেলেমানুষী হয়ে যাচ্ছে না? এত ভয় পাবার কী আছে? ঠাণ্ডা হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারলেই তো আর সমস্যা থাকে না। কাল সকালে মারচেস্টারবাসী যখন দেখবে সে লাশ নিয়ে পৌঁছেনি, তারা অবশ্যই খোঁজ নিতে আসবে। সম্ভবত ইথান আসবে। বুড়ো ইথান। বুড়ো এসে নিশ্চয়ই তার চিরাচরিত ভঙ্গিতে বলবে : 'এই যে জেব, তারপর একটা লাশের সঙ্গে রাত কাটাতে কেমন লাগল, বল দিকিনি?'

তারপর ওরা হাসিঠাট্টা করে যাত্রা শুরু করবে শহরের উদ্দেশে।

কিন্তু সে কাল সকালের কথা। এখন তো বাইরে ঝড় হচ্ছে-আর ওই লাশ।

গাড়ি থেকে নামল জেব, ইঞ্জিন নাড়াচাড়া করল। জানে, লাভ নেই। কারণ এ গাড়ি সহজে স্টার্ট হবার নয়।

শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল জেব, উঠে বসল ক্যাবে। কিন্তু পুরানো ক্যাব ঠাণ্ডা ঠেকাতে পারছে না। এখানে ওখানের ফুটো দিয়ে হু-হু করে বাতাস ঢুকছে, তুষারসহ। জেবের ঘাড়েও এসে জমল খানিকটা বরফ। হঠাৎ জেবের মনে পড়ল গাড়ির পেছনের অংশটা দিনকয়েক আগে মেরামত করেছে সে, ঝড়ো বাতাস ওটার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এখানে কয়েকটা দড়ির বান্ডিলও আছে। জিনসপত্র যেন না ভাঙে সেইজন্য জেব ওগুলো রেখেছে। সবই ঠিক ছিল। ইস্, শুধু যদি কফিনটা ওখানে না থাকত! কফিনের পাশে শুয়ে কেউ ঘুমাতে পারে? চট করে বুদ্ধিটা খেলল জেবের মাথায়। কফিনটাকে ক্যাবের মধ্যে এনে রাখলেই হয়। তাহলেই ওখানে প্রচুর জায়গা হবে, জেব অনায়েসে পা ছড়িয়ে শুতে পারবে। দড়ির বান্ডিল জায়গাটাকে গরম রাখবে।

মনস্থির করে ফেলল জেব। কাজে লেগে গেল। তবে কাজটা কঠিন, সময়সাপেক্ষও বটে। কফিনটা বেশ ভারী, ক্যাবটা ছোট, ঠেলেঠুলে ঢোকাতে হলো। কাজ শেষে সন্তুষ্টচিত্তে ভ্যানের পেছনের অংশে ঢুকল জেব, বন্ধ করল দরজা, ঘুমাবার জন্য দড়ির বান্ডিলের ওপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু সহজে ঘুম এল না। ঝড়ের গর্জন কানে বাড়ি মারছে জেবের। হঠাৎ হঠাৎ গাড়িটা কেঁপে উঠল যেন প্রবল বাতাস ধাক্কা দিয়েছে। বৈদ্যুতিক তারের গোঙানির শব্দ শুনল জেব। মিহি বরফ স্তূপ হয়ে জমছে গাড়ির ছাদে। আর্তনাদ করে উঠল লোহার একজস্ট পাইপ, ঠাণ্ডা হয়ে এল

ওটাও। বয়ে যেতে লাগল সময় অসহ্য মন্থর গতিতে।

হঠাৎ ঝট্ করে উঠে বসল জেব ওয়াটারস। ঘুমিয়ে পড়েছিল কি না জানে না, কিন্তু এখন ওর চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই।

গাড়ি চলছে! বরফের গায়ে টায়ারের শব্দ স্পষ্ট শুনল জেব, অল্প অল্প দুলছে ভ্যান। উঠে দাঁড়াল জেব, ক্যাব আর ভ্যানের পেছনের অংশটাক বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে কাঠের একটা দেয়াল, দেয়ালটার ছোট জানালায় মুখ চেপে ধরল সে।

এক মুহূর্ত কিছুই দেখতে পেল না জেব। জানালার সঙ্গে সেঁটে আছে মখমলের মত মসৃণ অন্ধকার। তারপর অন্ধকারে চোখ সয়ে এল। ক্যাবের মধ্যে একটা কাঠামো ধীরে ধীরে আকৃতি পেল, স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা লোক ড্রাইভারের সীটে বসে আছে আছে হুইল ধরে।

গাড়িটা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত চলছে। দুলছে আগের চেয়েও বেশি, চাকার শব্দ বিস্ফোরণের মত কানে বিঁধল। অদ্ভুত ব্যাপার, ইঞ্জিনের কোন শব্দ নেই! জেব গ্লাসের গায়ে টোকা দিল।

'হেই!' চিৎকার করে বলল সে-'গাড়ি থামাও!'

কিন্তু লোকটা তার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না। হুইলের ওপর তার হাত দুটো যেন আটকে আছে শক্তভাবে, কনুই দুটো দুপাশে ছড়ানো, কাঁধজোড়া ঈষৎ নিচু। সামনের অন্ধকার রাস্তা ছাড়া আর কিছুর প্রতি যেন আর নজর নেই। দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে উঠল ভ্যানের গতি।

ছোট জানালায় দড়াম করে ঘুসি মারল জেব। চৌচির হয়ে গেল গ্লাস্।

'আমার কথা কানে যায় না?'-গর্জে উঠল সে। 'গাড়ি থামাও! থামাও বলছি!'

এই সময় মাথা ঘোরাল লোকটা, তাকাল জেবের দিকে, আধা অন্ধকারেও তাকে চিনতে পারল জেব-পাণ্ডুর সাদা একটা মুখ, চকচকে কালো চোখ।

'ওহ্ খোদা,' গুঙিয়ে উঠল সে। 'ফি-ফিলিপ কার!'

মৃগী রোগীর মত ফোঁপাতে শুরু করল জেব, ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেয়াল চেপে ধরল দুহাতে।

'ফিলিপ কার,' আর্তনাদ বেরিয়ে এল জেবের গলা চিরে। 'তুমি মরে গেছ। তুমি মরে গেছ, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? মরামানুষ কিছুতেই গাড়ি চালাতে পারে না।'

ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটা ভয়ঙ্কর গলায় খল খল করে হেসে উঠল। ঝুঁকে পড়ল হুইলের ওপর, যেন আরও জোরে গাড়ি ছোটাবে। ভ্যানটাও যেন জাদুর স্পর্শে লাফিয়ে উঠল। উন্মাদের মত ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠল। ওটা অভিশপ্ত প্রাণীর মত প্রচণ্ড ঝাঁকি খাচ্ছে। বিশাল সাদা মেঘের আকৃতি নিয়ে রাশি রাশি বরফ বিদ্যুৎগতিতে ছুটে যাচ্ছে গাড়িটার পাশ দিয়ে। বাতাসের গর্জন নয়, যেন নেকড়ের ডাক!

হঠাৎ সাঁৎ করে বাঁ দিকের রাস্তায় মোড় নিল গাড়ি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে সোজা

এগোল অন্ধকার একটা খাদের দিকে। খাদের ঠিক মুখে একটা বিশাল গাছ, ঝড়ে ওটার ডালপালা প্রবল বিক্ষোভে আন্দোলিত হচ্ছে।

তারপরই প্রবল টা সংঘর্ষের শব্দ!

'ব্যাপারটা অদ্ভুত'-ভুরু কুঁচকে বললেন ডাক্তার।

বুড়ো ইথান থুতনি চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'অবস্থা দেখে মনে হয় জেবের গাড়িটা পাহাড়ের ঢালে উঠে নষ্ট হয়ে যায়। ওটাকে আর চালাবার উপায় নেই জেনে জেব নিশ্চয়ই ক্যাব ছেড়ে ভ্যানের পেছনের অংশে গিয়ে বসেছিল শরীর গরম রাখতে। আর রাতের বেলা প্রবল ঝড়ো হাওয়া গাড়িটাকে ঠেলে এই খাদের কাছে নিয়ে আসে এবং গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ওটা ভেঙে তুবড়ে যায়। আর বেচারা জেব তখনই মারা যায়। আপনার কি মনে হয়, ডাক্তার?'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ধারণা, ইথান।' জবাব দিলেন ডাক্তার। 'কিন্তু অবাক ব্যাপার জেবের শরীরে আঘাতের কোন চিহ্নই নেই। মনে হচ্ছে হার্টফেল করে মারা গেছে। আর ফিলিপ কারের লাশটা দেখুন...সংঘর্ষের ফলে কফিনটা সম্ভবত ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু রিগর মর্টিসের প্রভাবে সে ওভাবে বসে থাকবে এটাও ঠিক হিসেবে মিলছে না। ওর হাত দুটো লক্ষ করুন। মনে হচ্ছে না সে-ই আসলে গাড়িটা চালাচ্ছিল?'

দ্য হেডলেস ক্রিয়েচার
জে.বি. স্ট্যাম্পার

বাড়িটি দেখে হতাশ হলো জেনি উডহাউস। অবহেলিত, পরিত্যক্ত লাগছে প্রকাণ্ড বাড়িটি। জানালার কাঁচ দু'এক জায়গায় ভাঙা। দেয়ালের প্লাস্টার উঠে আছে কোথাও কোথাও। ভেতরের অনেক কাজ বাকি রয়ে গেছে এখনও। যেন শুরু করেছিল কেউ, তাড়াহুড়োর কারণে শেষ করে যেতে পারেনি। বাড়ির পেছনে আবার জঙ্গলও আছে। অন্ধকার জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে গা কেমন ছমছম করে উঠল জেনির। লম্বা লম্বা গাছ ছায়া ফেলেছে দোতলা বাড়িতে। সূর্যের আলো ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। ফলে ঘরগুলো ছায়াময়, অন্ধকার। জেনির মনে হলো ঘরগুলোতে গোপন কী এক রহস্য লুকিয়ে আছে।

স্কুল শুরু হওয়ার সপ্তাহখানেক আগে জেনি আর তার বাবা মা এ পুরানো বাড়িটিতে উঠে এসেছে। তাদের জিনিসপত্র ট্রেলারে করে আসছে। জেনির বাবা-মা শহর ছেড়ে এ গাঁয়ে এসেছেন এজন্য যে তাদের মেয়ে যেন নিরাপদে এবং খোলা পরিবেশে, তাজা হাওয়ায় বড় হয়ে উঠতে পারে। তবে বাড়ির চেহারা দেখে বাবা মাও হতাশ। কিন্তু তারা আশা করছেন জেনি এখানে ভালই থাকবে কারণ জেনির জন্যই তো অতদূর থেকে এখানে আসা।

জেনিদের বাড়িটি ভাড়া বাড়ি। বাড়ির মালিক দেশের বাইরে। একজন কেয়ারটেকার বাড়িটি দেখাশোনা করে। তবে বাড়ির যে তেমন 'কেয়ার' সে নেয় না, চেহারা দেখেই বোঝা যাচেছ। বাড়ির চাবি মি. উডহাউসের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে সে লাপাত্তা।

এখানে সন্ধ্যা নামে খুব দ্রুত। যেন ঝপ করে ঘোমটা ফেলল রাত। রাতে, পুরানো ডাইনিং টেবিলে খেতে বসল জেনি শুকনো মুখে। ওদের মালপত্র শহর থেকে এখনও এসে পৌঁছায়নি। তবে এ বাড়িতে খাট-পালঙ্ক সবই আছে দেখে অবাক হয়েছে সে। কেয়ারটেকার জানিয়েছে আগের ভাড়াটে তাদের আসবাব ফেলে নাকি চলে গেছে। কেন গেছে এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলেনি তার কাছে। বিড়বিড় করে কী বলেছে বোঝা যায়নি। কেটে পড়েছে লোকটা এবং যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

'এত মন খারাপ করে থাকতে হবে না,' মেয়ের শুকনো মুখ দেখে বললেন বাবা।

'এখানে কয়েকদিনের মধ্যে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবি তুই। একদিন থেকে এখানে এসে বেশ ভালই হয়েছে। তাজা বাতাস টানতে পারবি বুক ভরে। শহরের দূষিত বায়ু দিয়ে আর ফুসফুস ভরাতে হবে না। স্কুলে ভর্তি করে দেব তোকে আগামী হপ্তায়। বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে নিবি। দেখবি ঠিক হয়ে গেছে সব।'

বিদ্যুৎ নেই। মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলোয় বাবাকে দেখল জেনি। কী করে বাবাকে বোঝাবে এ বাড়ি ওর মোটেই পছন্দ হয়নি। কু'ডাক ডাকছে মন। এখান থেকে চলে যেতে ইচ্ছে করছে।

'ঠিকমত খাও, মা,' নরম গলায় বললেন মা। 'তারপর একটা ঘুম দাও। ঝরঝরে হয়ে যাবে শরীর। শারীরিক ক্লান্তি দূর হয়ে গেলে মনও ভাল হয়ে যাবে।'

আয়োজন খুব সামান্য। চিকেন স্যান্ডউইচ আর ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই জেনির খুব পছন্দ, কিন্তু আজ খেতে ভাল্লাগছে না। বাবা-মা রাগ করবেন, এ ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাচ্ছে। তাকিয়ে আছে জানালার দিকে। জানালার ওপাশে জঙ্গলটাকে দেখা যাচ্ছে। মোমের শিখা কাঁচের গায়ে প্রতিফলিত হচ্ছে। ছোট ছোট সোনালী চোখের মত দেখাচ্ছে।

ডাইনিং রুম থেকে জঙ্গল এবং আকাশ দুটোই পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে জেনি। হঠাৎ একটা কাঠামো চোখে পড়ল ওর। ওই তো এক গাছ থেকে চলে গেল আরেক গাছের আড়ালে। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল জেনির। তাকিয়ে আছে। আবার নড়ে উঠল ওটা। প্রথমে কোনও বড় প্রাণী ভেবেছিল জেনি। শহরের শেষ প্রান্তের এ জঙ্গলে উদবিড়াল টাইপের জানোয়ার থাকা বিচিত্র নয়, বাবা বলেছেন ওকে। তবে ওটা জন্তু-জানোয়ার নয়। মানুষ। বাড়ির দিকে হেঁটে আসছে সাদা একটা ড্রেস পরা এক মহিলা। সোজা জানালা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। জঙ্গলের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল সে। ভয়ানক আঁতকে উঠল জেনি। মহিলাই বটে। তবে মহিলার ধড়ের উপর কিছু নেই। মুণ্ডুহীন একটা মানুষ।

আঁ আঁ করে চিৎকার দিল জেনি। বাবা-মা চমকে তাকালেন ওর দিকে। 'ভূ-ভূত!' জানালার দিকে আঙুল দেখাচ্ছে জেনি। বাবা-মা দৌড়ে গেলেন জানালার সামনে। কিন্তু তার আগেই রাতের আঁধারে মিলিয়ে গেছে মুণ্ডুহীন প্রেত।

জেনি টেবিলে বসে থরথর করে কাঁপছে ভয়ে।

'আমি দেখেছি', কাঁদতে কাঁদতে বলল ও। 'এক মহিলা। মাথা নেই।'

বাবা জানালার সামনে থেকে ফিরে এলেন। জড়িয়ে ধরলেন মেয়েকে। মা'র সঙ্গে চাওয়াচাওয়ি করলেন। তাঁদের দৃষ্টি বিনিময় দেখে বুঝতে পারল জেনি ওর কথা বিশ্বাস করেননি ওঁরা।

সরু তাকের সিঁড়ি মাড়িয়ে দোতলায় নিজের শোবার ঘরে চলে এল জেনি। হাতে প্রিয় লেখকের হরর গল্প সংকলন। বিদ্যুৎ আসেনি এখনও। মা মোম জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। অদ্ভুত ঘরটির চারপাশে চোখ বুলাল জেনি। এ ঘরের দেয়ালে ওয়াল পেপার

লাগানো। তবে অযত্নে জীর্ণ ওয়াল পেপার। জানালার পর্দা নেই। ওদের মালপত্রের ট্রেলার পৌঁছে গেলেই জানালার পর্দা লাগিয়ে দেবেন বলেছেন মা।

বিছানায় উঠে পড়ল জেনি। পড়তে লাগল বই। বইয়ের জগতে ডুবে গেলে পারিপার্শ্বিকতা সব ভুলে যায় জেনি। ঘন্টাখানেক পর ওর মা এলেন ঘরে। ওর পাশে বসলেন। এটাসেটা নিয়ে গল্প করলেন কিছুক্ষণ। তারপর মেয়ের কপালে চুমু খেয়ে সিধে হলেন। 'ঘুমিয়ে পড়ো, মা। আর পড়তে হবে না। নতুন জায়গায় প্রথম প্রথম একটু অস্বস্তি লাগবে। তারপর ঠিক হয়ে যাবে সব।' ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেভালেন তিনি। চলে গেলেন।

চোখ বুজল জেনি। ঘুমাবার চেষ্টা করল। হঠাৎ শাঁ শাঁ আওয়াজে চমকে উঠল। চাইল চোখ মেলে। জানালার বাইরে উদ্বাহু নৃত্য শুরু করে দিয়েছে গাছপালা। ঝড় শুরু হয়েছে। আর্তনাদ ছাড়ছে বাতাস, বাড়ি খাচ্ছে জেনিদের বাড়ির দেয়ালে। গাছের ডাল বাড়ি খাচ্ছে ছাদে। বাতাসের গর্জন ছাপিয়ে ঠকঠক একটা শব্দ প্রকট হয়ে বাজল কানে। জেনির ঘরের জানালা দিয়ে শব্দটা। নিশ্চয় গাছের ডাল বাড়ি খাচ্ছে তাই এমন আওয়াজ হচ্ছে, নিজেকে বোঝাল জেনি।

কিন্তু ঠকঠক শব্দটা থামল না। শেষে আর সহ্য করতে পারল না জেনি। মস্তিষ্কে বাড়ি মারছে আওয়াজ। বিছানা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে নেমে পড়ল। পা টিপে টিপে এগোল জানালার দিকে। আকাশে ফকফকা চাঁদ। চাঁদের রূপোলি আলোয় দেখল ও যা ভেবেছিল ঠিক তাই। বাতাসে একটা গাছের ডাল বাড়ি খাচ্ছে জানালার কাচে। শব্দ উঠছে ঠকঠক। ফোঁস করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জেনি। তাকাল নীচে। পর মুহূর্তে হিম হয়ে গেল বুকের রক্ত।

ওর জানালার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে আছে মুণ্ডুহীন সেই প্রেত। হাত উঁচিয়ে রেখেছে সে যেন ধরে ফেলবে জেনিকে। তার ধড়ের উপর রক্তাক্ত একটা পিণ্ড ছাড়া কিছু নেই।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার দিল জেনি, এক দৌড়ে চলে এল বিছানায়। হাঁ করা গলা থেকে একের পর এক চিৎকার বেরিয়ে আসছে। বাবা মা ছুটে এলেন মেয়ের চিৎকার শুনে। সুইচ টিপে বাতি জ্বালালেন।

'ওই মহিলা আবার,' ফোঁপাচ্ছে জেনি। 'মুণ্ডুহীন সেই মহিলা। ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার জানালার ঠিক নীচে।'

বাবা মা ছুটে গেলেন জানালার সামনে। তাকালেন নীচে। বাতাসে নৃত্যরত গাছ ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না তাঁদের।

'জেনি, তুমি এখন বড় হয়েছ,' বাবা ফিরে এলেন মেয়ের কাছে 'ভূতের ভয় পাবার বয়স তোমার নেই।' বালিশের পাশ থেকে হরর বইটা তুলে নিলেন তিনি গম্ভীর মুখে। 'এসব ছাঁইপাশ পড়তে নিষেধ করেছি না তোমাকে?' সিধে হলেন তিনি বই হাতে, নিভিয়ে দিলেন বাতি। আর একটিও কথা না বলে চলে গেলেন মাকে নিয়ে। মা মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলেন, বাবার ভয়ে পারলেন না।

মাথার উপর চাদর টেনে দিল জেনি। অন্ধকারে কাঁদছে। বাবার উপর রাগ হচ্ছে খুব। ওর বয়স এমন কিছু নয়-দু'মাস হলো চোদ্দতে পা দিয়েছে। চোদ্দ বছরের মেয়েদের ভূতের ভয় পাওয়া নিষেধ? আর সে তো হরর বই পড়ে ভয় পায়নি, সত্যি সত্যি ভূত দেখেছে। কিন্তু বাবা-মাকে এ কথা কীভাবে বিশ্বাস করাবে জেনি? পিশাচিনীর কথা ভাবতে ভাবতে আর কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল জেনি।

পরদিন ভোরে একগাদা বাজার করে নিয়ে এলেন মি. উডহাউস। মাকে সাংসারিক কাজে সাহায্য করতে লাগল জেনি। দিনের আলোয় কেটে গেছে ভয়। বরং গত রাতের ঘটনাটার কথা এখন বিশ্বাস হতে চাইছে না। মনে হচ্ছে পুরো ব্যাপারটা ছিল কল্পনা।

বাবা ন'টার দিকে চলে গেলেন অফিসে। মা রান্নাঘরে ব্যস্ত, সদর দরজার কলিংবেল বাজাল কেউ। 'আমি দেখছি' বলে সব্জির ঝুড়ি সরিয়ে খাড়া হলো জেনি। গিয়ে দরজা খুলল। ফর্সা এক মহিলা, মাথা ভর্তি লাল চুল, লাল টকটকে লিপস্টিক চর্চিত ঠোঁটে হাসলেন জেনির দিকে তাকিয়ে। 'তোমরা এ বাড়িতে নতুন এসেছ, না?'

মাথা ঝাঁকাল জেনি। প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে।

'আমি মিসেস ও'লিয়েরী। এখানকার একটা স্কুলে পড়াই। তোমার মা আছেন বাড়িতে?'

আবারও মাথা ঝাঁকাল জেনি। পেছন থেকে বলে উঠলেন মা, 'কে রে, জেনি?' দেখতে এসেছেন কার সঙ্গে কথা বলছে তাঁর মেয়ে।

মিসেস ও'লিয়েরী অত্যন্ত বাচাল প্রকৃতির মহিলা। বকবক করে তাদের কানের পোকা নড়িয়ে দিলেন পাঁচ মিনিটের মধ্যে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার জীবন ইতিহাস জেনে ফেলল তৃষা। জানল মিসেস ও'লিয়েরী বিধবা, তার কিন্ডারগার্টেন স্কুলে বেবী-সিটিং-এর ব্যবস্থাও করেছেন। কর্মজীবী মায়েরা বাচ্চাদর নির্ভাবনায় তার স্কুলে রেখে যায়। প্রয়োজন হলে তিনি মাঝে মাঝে জেনিকে এসে সঙ্গ দিয়ে যাবেন। শুনে মা কৃতজ্ঞ বোধ করলেও খুশি হতে পারল না জেনি। কারণ প্রথম দর্শনেই মহিলাকে অপছন্দ হয়েছে তার। বাচাল মানুষ একেবারেই সইতে পারে না সে। বছরের ছ'মাস পার হয়ে যাওয়ার পরেও এখানকার বেসরকারী গার্লস স্কুলে যাতে জেনি ভর্তি হতে পারে সে ব্যাপারে সর্বতো সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় হলেন মিসেস ও'লিয়েরী। যাওয়ার আগে এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসলেন জেনির দিকে তাকিয়ে, গা শিরশির করে উঠল ওর।

মালপত্রের ট্রেলার কবে আসে ঠিক নেই, মা বিকেলে জেনিকে নিয়ে শহরে গেলেন। সংসারের প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনলেন। আর জেনি কিনল বই। ছিমছাম, ছোট এ শহরে দুটো বইয়ের দোকান। তাদের কালেকশন খারাপ না। যেসব বই স্টকে নেই সেগুলো অর্ডার দিলে আনিয়ে দেয়। জেনি অবশ্য পছন্দের বই-ই শুধু কিনল না, ক্লাসের বইও কিনতে হলো।

কেনাকাটা করে বাসায় ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। বাবা তখনও ফেরেননি অফিস থেকে। ট্যাক্সি থেকে মালপত্র নামাল জেনিরা। মা কিছু জিনিস নিলেন, বাকিগুলো বহন করল জেনি।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে মনে পড়ল লেটেস্ট কিশোর ক্লাসিকের বই দুটো সে দোকানে রেখে এসেছে। নিজের উপর রাগ হলো জেনির। এখন আবার দোকানে ছুটতে হবে। কাল গেলেও হয়। কিন্তু কাল রবিবার। মার্কেট বন্ধ। নাহ্‌, বইদুটো এখনই চাই ওর। নতুন বই বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে পড়তে না পারলে ঘুম হয় না জেনির। সে মাকে বই রেখে আসার কথা বলল। জানাল ট্যাক্সি নিয়ে সে মার্কেটে যাবে আর আসবে। যে ট্যাক্সি করে ওরা এসেছিল সে ট্যাক্সিঅলাকে তখনও ভাড়া দেয়া হয়নি। জেনি মা'র কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে ওই ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল আবার। মা সঙ্গে আসতে চাইলেন। নিষেধ করল জেনি। এই ট্যাক্সিতেই সে ফিরবে। কাজেই দুশ্চিন্তা করতে হবে না মাকে। নিরাপদেই ফিরবে।

কিন্তু নিরাপদে ফিরতে পারল না জেনি। বাড়ি থেকে প্রায় শ খানেক গজ দূরে যখন সে, ট্যাক্সির একটা চাকা হঠাৎ পাংচার হয়ে গেল। জেনি ট্যাক্সিঅলাকে ভাড়া দিয়ে হাঁটা দিল বাড়ির উদ্দেশে। বুকে ধরে আছে বই। ওই তো ওদের বাড়ি। চাঁদের আলোয় সাদা রঙের বাড়িটাকে ম্লান দেখাচ্ছে। এই প্রথম লক্ষ করল জেনি ওদের বাড়িতে অসংখ্য জানালা। এত বেশি জানালা যে ওগুলো ঠিকমত বন্ধ করে না রাখলে যে কেউ ঢুকে পড়তে পারবে ঘরে। ভাবনাটা শরীরে কাঁপন ধরিয়ে দিল জেনির। অজান্তে বেড়ে গেল হাঁটার গতি।

আর ঠিক তখন, রাস্তার পাশের ঘন গাছের আড়াল থেকে গাঢ় একটা ছায়া বেরিয়ে এল। এক জোড়া হাত জড়িয়ে ধরল ওকে। বরফ ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে ছ্যাঁৎ করে উঠল গা। সেই মুণ্ডুহীন প্রেত!

গলা দিয়ে তীব্র আর্তনাদ বেরিয়ে এল জেনির। শরীরে ঝাঁকি দিয়ে বন্ধন মুক্ত হলো। পরমুহূর্তে আবার হাত জোড়া ছুটে এল ওকে ধরার জন্য। দৌড়াল জেনি। অল্পের জন্য মিস হলো টার্গেট। ধরতে পারল না ওকে পৈশাচিক হাত জোড়া। হিস্টিরিয়া রোগীর মত ফোঁপাতে ফোঁপাতে, ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে পড়ল জেনি। মাকে ডাকছে।

'আবার সে।' কাঁদতে কাঁদতে বলল জেনি। 'সে-ই মুণ্ডুহীন প্রেত। আমাকে ধরার চেষ্টা করছিল।'

মা সান্ত্বনা দিলেন ওকে। বোঝানোর চেষ্টা করলেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাবা অফিস থেকে ফেরার পর তাঁকে আজকের ঘটনা বললেন মা। বাবা গম্ভীর মুখে সব শুনলেন। আজ আর মেয়ের উপর রাগ করলেন না। বরং মায়া হলো মেয়ের জন্য। মেয়েটা যখন বারবার ভয় পাচ্ছে, এ বাড়িতে না থাকাই ভাল। সিদ্ধান্ত নিলেন কাল, ছুটির দিনে নতুন বাড়ি খুঁজতে বেরুবেন।

পরদিন বিকেলে বাবা-মা বাড়ি খুঁজতে বেরুলেন। জেনি গেল না। সে ক্লাসিকে মশগুল। তা ছাড়া বাবা-মা সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবেন। সে ততক্ষণ একা থাকতে পারবে।

ঘন্টাখানেক পর বেজে উঠল কলিংবেল। দোতলা থেকে নেমে এল জেনি। দরজা খুলল। অন্ধকার ঘনাল চেহারায়। নাহ্, বাবা-মা ফেরেননি, মিসেস ও'লিয়েরী।

'মা বাড়ি নেই,' দরজা আগলে রেখে বলল জেনি।

'জানি,' হাসলেন লালচুলো মহিলা। 'তোমার বাবা-মা বাসা খুঁজতে গেছেন। রাস্তায় দেখা হলো। তোমার মা বললেন তুমি বাড়িতে একা। আবার ভয়-টয় পাও কিনা। অনুরোধ করলেন তোমাকে যেন একটু সঙ্গ দিই।' জেনির বলতে ইচ্ছে করল সে ভয় পাবে না এবং এ মুহূর্তে কারও সঙ্গ তার দরকার নেই। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই মহিলা তাকে একরকম ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়লেন ভেতরে। এগোলেন ড্রইংরুমের দিকে। জেনিকেও তার পেছন পেছন যেতে হলো।

মহিলা ড্রইংরুমে বসলেন না। একের পর এক ঘরে ঢুকলেন এমন ভঙ্গিতে যেন তার সব কিছু চেনা। 'আপনি এ বাড়িতে আগে কখনও এসেছেন?' জিজ্ঞেস করল জেনি।

'আমরা তো এ বাড়িতেই থাকতাম,' আবছা গলায় জবাব দিলেন মিসেস ও'লিয়েরী। 'আমার স্বামীর মৃত্যুর পরে চলে যাই এখান থেকে'

'আপনারা যাবার পর কারা থাকত এখানে?' জানতে চাইল জেনি।

'এসেছিল দু'একজন। কিন্তু কেউ দুই এক হপ্তার বেশি থাকতে পারেনি,' হঠাৎ খনখনে গলায় হেসে উঠলেন মহিলা। গাঁয়ে কাঁটা দিল জেনির।

'কেন?' ঢোক গিলল জেনি।

'তুমি ছোট মানুষ। শুনলে ভয় পাবে,' মিসেস ও'লিয়েরী স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন জেনির দিকে।

'আমি ভয় পাব না।' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল জেনি। 'আপনি বলুন না।'

মনে মনে প্রার্থনা করছেন মিসেস উডহাউস। মুখ সাদা হয়ে গেছে তাঁর। জোরে জোরে হাঁটছেন স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে। কারণ কোন ট্যাক্সি বা অন্য কোন যানবাহন পাননি বাড়ি ফেরার জন্য। এখান থেকে তাদের বাড়ি কমপক্ষে এক মাইল দূরে। ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারবেন তো? শহরের একমাত্র স্কুলের প্রিন্সিপালের কাছ থেকে একটু আগে যা শুনে এসেছেন, বমি ঠেলে আসছে পেট থেকে। যীশাস, আমার মেয়েটাকে বাঁচাও...

বিছানায় শুয়ে আছে জেনি। মনোযোগ দিতে পারছে না হাতে ধরা বইতে। ভয়ে কাঁপছে বুকের ভেতরটা। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে বাবা-মা যেন ফিরে আসেন এখুনি। এ বাড়ি নিয়ে নোংরা এবং ভয়ঙ্কর এক গল্প শুনিয়েছেন মিসেস ও'লিয়েরী।

এক নৃশংস খুনের কাহিনি। এ বাড়িতে এক দম্পতি থাকত। পুরুষটা তার কিশোরী কাজের মেয়ের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। পুরুষটার স্ত্রী এতে বাধা দিলে সে মহিলাকে জবাই করে হত্যা করে। তারপর কাজের মেয়েটাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এরপর থেকে এ বাড়ি প্রায় পোড়োবাড়ির মত হয়ে গেছে। কেউ এখানে এসে টিকতে পারে না। তারা কি কোন মুণ্ডুহীন মহিলাকে দেখেছে? ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছে জেনি। জবাবে রহস্যময় হাসি হেসেছেন মিসেস ও'লিয়েরী, জবাব দেননি। তারপর একরকম জোর করে জেনিকে তার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন গরম দুধ নিয়ে আসছেন তিনি জেনির জন্য। কিন্তু তাও তো কুড়ি মিনিট হয়ে গেল। এখনও দুধ নিয়ে আসছেন না কেন মহিলা? একা থাকতে ভয় লাগছে জেনির। সে নেমে পড়ল বিছানা থেকে। জানালা দিয়ে হু হু করে বাতাস ঢুকছে। কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে গায়ে। জানালা বন্ধ করার জন্য ওদিকে পা বাড়াল জেনি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দ্রুত। জানালা বন্ধ করতে গিয়ে চোখ চলে গেল নীচে। সঙ্গে সঙ্গে জমে বরফ হয়ে গেল ও। ওর জানালার নীচে পায়চারি করছে মুণ্ডুহীন প্রেত!

কাঁপতে কাঁপতে জানালার সামনে থেকে সরে এল জেনি। মিসেস ও'লিয়েরীর নাম ধরে গলা ফাটিয়ে ডাকতে লাগল। চেঁচাতে চেঁচাতে ভেঙে গেল গলা। কিন্তু মহিলার কোনও সাড়া নেই। বেডরুমে থাকতে আর সাহস পাচ্ছে না জেনি। উন্মাদের মত নামতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে। এককেবারে দুটো করে ধাপ টপকাচ্ছে। এক ছুটে ঢুকে পড়ল ড্রইংরুমে। এখানে বসে গল্প করছিল ও মহিলার সঙ্গে।

ঘর খালি। চেয়ারে কেউ নেই। শুধু ঘরের মাঝখানে, টী টেবিলের উপর পড়ে আছে মিসেস ও'লিয়েরীর কাটা মুণ্ডুটা। লাল চুলগুলো এলিয়ে পড়েছে টেবিলে। কালো চোখজোড়ার স্থির দৃষ্টি জেনির দিকে। লিপস্টিক মাখা পাতলা লাল ঠোঁট বেঁকে আছে বিদ্রূপের হাসিতে।

আর্তনাদ ছাড়ল জেনি। আবার দৌড় দিতে যাবে সিঁড়ির দিকে, দড়াম করে খুলে গেল সদর দরজা। মিসেস ও'লিয়েরীর মুণ্ডুহীন ধড় ঢুকল ঘরে। বড় বড় নখঅলা হাত জোড়া সামনের দিকে বাড়ানো। এগিয়ে আসতে লাগল সে ভয়ে পাথর হয়ে যাওয়া জেনির দিকে।

কীপ ইন হিজ প্রমিস
এলগারনন ব্ল্যাকউড

রাত এগারোটা। লন্ডন শহরের এডিনবার্গ অঞ্চলের রাস্তাঘাট নির্জন, নিস্তব্ধ। পথে লোকজনের যাতায়াত খুবই কম। রাস্তার ধারের এক হোস্টেলের চার তলায় থাকে ম্যারিয়ট। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সে। এই হোস্টেলে তার মতো কিছু ছাত্র এবং সাধারণ কেরাণী চাকরীজীবী থাকে।

ম্যারিয়ট মন দিয়ে পড়া মুখস্ত করছে। দরজায় খিল লাগানো। সে বেশ কয়েকবার পরীক্ষায় ফেল করায় তার বাবা-মা হুমকি দিয়েছেন-এটাই তার শেষ সুযোগ। আর তাঁরা টাকা পয়সা খরচ করতে পারবেন না। ম্যারিয়ট সে কথা মনে রেখেই এবার জানপ্রাণ দিয়ে লড়ে যাচ্ছে-এবার তাকে পরীক্ষায় পাশ করতেই হবে। কারণ তাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালো নয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে সে এরকম নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করে যাচ্ছে। তার পরিচিতরা ব্যাপারটা জানতো তাই তার পড়ার কোন ব্যাঘাত ঘটাতো না।

হঠাৎ কলিং বেল বেজে উঠল। এতো রাতে বেল বাজার শব্দ শুনে ম্যারিয়ট অবাক হলো। এতো রাতে কে আবার এলো?

বাড়িওয়ালি রোজ ঠিক রাত দশটার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে যায়। এরপর দরজায় বেল বাজলে সে না শোনার ভান করে। ম্যারিয়ট ভাবল আগন্তুকের আসার উদ্দেশ্য জেনে নিয়ে তাকে বিদায় করে দেবে। তাই সে দরজা খোলার জন্য টেবিল ছেড়ে উঠল।

পাথর বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ম্যারিয়ট আবার বেল বাজানোর শব্দ শুনতে পেল। রাগ ও বিরক্তির সঙ্গে দ্রুতপায়ে নিচে নেমে এলো। দরজা খুলে বলল, 'সব্বাই জানে যে, আমি পরীক্ষার পড়া তৈরি করছি আর এই অসময়ে এসে কেন বিরক্ত করা হচ্ছে?'

বই হাতে ম্যারিয়ট দরজা খুলে দাঁড়িয়ে নিজের মত বকে যাচ্ছিল। কিন্তু আগন্তুক কই! জুতোর খসখস শব্দ শোনা যাচ্ছে এতো কাছে এবং এতো জোরে যে মনে হচ্ছে পা দুটো যেন আগে আগে আসছে। আগন্তুক যেই-ই হোক না কেন অসময়ে কাজে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য তাকে কড়া কথা শোনাতে ম্যারিয়ট রেডি হয়ে এসেছে।

অনেকক্ষণ সে একইভাবে দাঁড়িয়ে রইল। আগন্তুকটির দেখা নেই। পায়ের শব্দটা খুব কাছ থেকে শোনা যাচ্ছে, তবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

এবার ভয়ে তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। একবার ভাবল চিৎকার করে অদৃশ্য আগন্তুকটিকে ডাকবে তারপর ভাবল না; দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে আবার ওপরে গিয়ে পড়ায় মন দেবে। এই সব সাতপাঁচ ভাবছিল ম্যারিয়ট। হঠাৎ সেই জুতোর শব্দটা একেবারে কাছে শোনা গেল এবং আগন্তুককে দেখা গেল।

আগন্তুক বয়সে তরুণ, বেঁটে খাটো, মোটা। মুখটা চুনের মতো সাদা, উজ্জ্বল চোখ দুটোর তলায় কালো দাগ। একমুখ দাড়ি। চুল আলুথালু আর পোশাকের পরিপাট্য দেখে তাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হলো ম্যারিয়টের। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার তার মাথায় কোন টুপি নেই; এমন কি গায়ে ওভারকোট বা হাতে ছাতাও নেই। অথচ সন্ধ্যে থেকেই অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে।

লোকটিকে দেখে ম্যারিয়টের মনে নানারকম প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল। তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল-কে আপনি? আর কেনই বা এতো রাতে এখানে? রাস্তার গ্যাসের আলো তার মুখের ওপর পড়ল। চমকে উঠল ম্যারিয়ট। চিনতে পারল আগন্তুককে। ফিল্ড! ফিল্ড, তুমি বেঁচে আছ? ভয়ে ম্যারিয়টের দমবন্ধ হবার জোগাড় হলো।

ম্যারিয়ট এই ফিল্ডের সঙ্গে একই স্কুলে পড়ত। সে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তাই-ই হয়েছে। তার বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে পরে একবারই মাত্র দেখা হয়েছিল। ম্যারিয়টের বাড়ির কাছেই ফিল্ড থাকত। তাই তার বোনেদের মারফত সব খবরই ম্যারিয়ট পেত। ফিল্ড অসংযত জীবনযাপন করত। মদ, আফিং, চরস-এর নেশায় বুঁদ হয়ে থাকত। সে একেবারে উচ্ছন্নে চলে যায়।

ম্যারিয়টের রাগ-বিরক্তি মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। সে তাকে ভেতরে আসতে বলল। বলল, 'মনে হচ্ছে কিছু ঘোঁট পাকিয়েছো। এসো ভেতরে, সব শুনছি। আমাকে সব খুলে বলো-হয়তো আমি কোন সাহায্য-' আর কি বলবে ম্যারিয়ট ভেবে পেল না, শুধু সে তো তো করতে লাগল। তারপর নিজেকে সংযত করে, সদর দরজাটা বন্ধ করে বন্ধুকে নিয়ে ম্যারিয়ট হলের দিকে এগোতে লাগল। ফিল্ড খুব পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত। তার টলায়মান পা দুটো দেখলেই বোঝা যায়। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে অনেকদিন সে কিছু খায়নি।

ম্যারিয়ট এবার হাসিমুখে সমবেদনার স্বরে বলল-'আমার সঙ্গে এসো, তোমাকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি খেতে যাচ্ছিলাম, তুমি ঠিক সময়েই এসেছো।'

ফিল্ডের দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। সে এতোই দুর্বলভাবে হাঁটছিল যে ম্যারিয়ট তার হাতটা ধরে নিয়ে চলল। এই প্রথম সে লক্ষ্য করল ফিল্ডের জামা কাপড় তার গায়ে মোটেই ফিট করেনি। খুব ঢিলেঢালা লাগছে। তার বিরাট চেহারাটা কঙ্কালসার।

ফিল্ডকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সোফাতে বসালো ম্যারিয়ট। আশ্চর্য হচ্ছিল ভেবে কোথা থেকে ফিল্ড এলো আর কি করেই বা সে তার ঠিকানা জানল।

ম্যারিয়ট বলল, 'ফিল্ড, তুমি সোফায় বিশ্রাম করো কিছুক্ষণ, তুমি খুব ক্লান্ত। পরে তোমার কাছে সব শুনব। তখন দুজনে মিলে যা হোক একটা কিছু ঠিক করা যাবে।'

ফিল্ড সোফায় বসে কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ম্যারিয়ট আলমারী থেকে বাদামী রঙের পাউরুটি, কেক এবং একটা বড় পাত্রে কমলালেবুর আচার বের করল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল ফিল্ডের চোখ দুটো ভীষণ চকচক করছে। ম্যারিয়ট ভাবল এটা নিশ্চয়ই কোন ওষুধের জের। ওর অবস্থা খুবই শোচনীয়। কথা বলবার শক্তিও বোধহয় তার নেই।

ম্যারিয়ট কোকো তৈরী করার জন্য স্পিরিট ল্যাম্প জ্বালাল। পানি যখন ফুটছে তখন খাবার টেবিলটা সোফার কাছে টেনে নিয়ে এলো যাতে ফিল্ডের চেয়ারে উঠে গিয়ে বসতে কষ্ট না হয়। 'এসো, এখন খাওয়া যাক।' বলল ম্যারিয়ট। 'তারপর পাইপ টানতে টানতে গল্প করব। এবার পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছি। যদিও খুব ব্যস্ত এখন আমি, তবুও তোমার মতো বন্ধুকে কাছে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে।'

ম্যারিয়ট আবার ফিল্ডের দিকে তাকিয়ে দেখল তার অতিথি বন্ধুটি তার দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। ম্যারিয়টের মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা শিহরণ বয়ে গেল। ফিল্ডের মুখ মরার মতো ফ্যাকাসে, ব্যথা ও কষ্টের ছাপ তার মুখে ফুটে উঠেছে।

'এইরে!' ম্যারিয়ট লাফিয়ে উঠল। 'এক্কেবারে ভুলেই গেছিলাম।' বলে আলমারী থেকে মদের বোতল আর গেলাস বার করল। গেলাসে মদ ঢেলে ফিল্ডকে দিল। ফিল্ড পানি না মিশিয়ে সেটা এক ঢোকে শেষ করল। ম্যারিয়ট লক্ষ্য করল ফিল্ডের কোটটা ধুলোয় ভর্তি, কাঁধে মাকড়সার জাল। কোটটা শুকনো খটখটে। বৃষ্টি-ঝরা রাতে ফিল্ড এসেছে-টুপি, ছাতা, ওভারকোট কিছুই নেই-অথচ শুকনো, এমনকি ধুলোভর্তি! ব্যাপারটার অর্থ কিছুতেই মেলাতে পারছিল না ম্যারিয়ট। তবে কি ফিল্ড এই বাড়িতেই কোথাও লুকিয়েছিল?

তবু ম্যারিয়ট কিছুই জিজ্ঞেস করল না। ঠিক করেছে, ফিল্ডের খাওয়া ও ঘুম না হওয়া পর্যন্ত তাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না। খাবার এবং ঘুম এ দুটোই এখন তার খুবই প্রয়োজন। একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ফিল্ডকে কিছু জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না। তারা দুজনে খেতে লাগল। ম্যারিয়ট একাই কথা বলে যাচ্ছে। তার নিজের সম্বন্ধে, তার পরীক্ষার ব্যাপারে, বুড়ি বাড়িওয়ালির কথা-একনাগাড়ে বলেই চলেছে। ম্যারিয়টের খাবার কোনো ইচ্ছা নেই, হাতে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। যদিও ফিল্ড গোগ্রাসে গিলছে। একজন ক্ষুধার্তের এভাবে ঠাণ্ডা, বাসি খাবার খাওয়ার আগ্রহ দেখে ম্যারিয়ট ভাবছিল, ফিল্ডের গলায় আবার খাবার আটকে না যায়!

কিন্তু ফিল্ড যেমন ক্ষুধার্ত ছিল তেমনি তার ঘুম পাচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়ছে, মুখের খাবার চিবোনো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ম্যারিয়ট বারবার তাকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে রাখছিল। আর ফিল্ড পশুর মতো গরগর করে খাবার মুখে পুরে সরু গলনালি দিয়ে গিলে ফেলছে।

শেষ কেকটি ফিল্ড গিলে নেবার পর বোকার মত ম্যারিয়ট বলল-'তোমাকে দেবার মতো আমার আর কিছুই নেই।'

ফিল্ড কিছুই বলল না। তার নিজের জায়গায় প্রায় ঘুমিয়ে পড়ার দশা। ক্লান্ত ও কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে একবার চোখ তুলে দেখল।

'এখন তোমার একটু ঘুমের দরকার, নাহলে তোমার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আমাকে সারারাত জেগে পড়াশোনা করতে হবে। আমার বিছানায় তুমি আরাম করে শোও। কাল একটু বেলাতে ব্রেকফাস্ট করব কেমন, আর-আর দেখি কি করা যায়।' ঘরের গুমোট পরিবেশ হালকা করার জন্য ম্যারিয়ট বলল।

ফিল্ড যেন মৃত্যুর নীরবতা পালন করে চলেছে। তার মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে ম্যারিয়ট তাকে তার ছোট শোবার ঘরে নিয়ে গেল। ফিল্ড জমিদারের ছেলে। তাদের বিশাল অট্টালিকা। তার কাছে এই ছোট সামান্য ঘরটা নেহাতই পুতুলঘরের মতোই।

ক্লান্ত ফিল্ড কোন ধন্যবাদ না দিয়ে কিংবা ভদ্রতার ভাণ না করে বন্ধুর হাতে ভর দিয়ে পা টেনে টেনে ঘরে গেল। ম্যারিয়ট তাকে তার গায়ের পোশাকশুদ্ধ বিছানায় শুইয়ে দিল।

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ম্যারিয়ট তার আপাদমস্তক দেখল। পরমুহূর্তেই তার চিন্তা হলো, এই অনাহুত অতিথিকে নিয়ে কাল সে কি করবে? কিন্তু বেশিক্ষণ এ ভাবনা তাকে উতলা করতে পারল না, কারণ পরীক্ষার টেনশনটা তাকে বড্ড খোঁচাচ্ছে।

দরজায় খিল লাগিয়ে সে আবার পড়তে বসল বই নিয়ে। মেটিরিয়া মেডিকার যেখান থেকে নোট করতে করতে কলিং বেল শুনে উঠে গিয়েছিল, সেখানে আবার মনোনিবেশ করল। কিন্তু সে বেশ খানিকক্ষণ মনসংযোগ করতে পারল না। তার চিন্তা কেবলই সেই মূর্তিটিতে ঘুরপাক খাচ্ছে-সাদা ফ্যাকাসে মড়ার মতো মুখ, অদ্ভুত জ্বলন্ত চোখ, ক্ষুধার্ত ও মলিন বেশ, পোশাক ও জুতো পরে ফিল্ডের বিছানায় শুয়ে থাকা।

হঠাৎ ম্যারিয়টের একটা শপথের কথা মনে পড়ে গেল। ইস্ একেবারে ভুলে গিয়েছিল!

ম্যারিয়ট আধখোলা দরজা দিয়ে ছোট শোবার ঘরটা থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল। শ্রান্ত, ক্লান্ত মানুষের গভীর নিদ্রা তাকেও বিছানার দিকে আকর্ষণ করছিল।

ম্যারিয়ট ভাবল, একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক, খুব ঘুম পাচ্ছে।

তখন বাইরে সোঁ সোঁ শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে; সার্সিতে ও রাস্তায় অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। ম্যারিয়ট পুনরায় পড়ায় মনসংযোগ করার চেষ্টা করল; কিন্তু বই পড়তে পড়তে সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল পাশের ঘরের লোকটির ভারি ও গভীর নিঃশ্বাস!

প্রথমে, হয় ঘরের অন্ধকারে সে কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। নয়তো, আলোয় এতোক্ষণ বসে থাকার কারণে তার চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। কিছুই সে ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না-আসবাবগুলি কালো ঢেলার মত, দেয়ালে ড্রয়ারের আলমারীটা একটা কালো বস্তু, ঘরের মাঝখানে সাদা বাথটাবটা যেন একটা সাদা প্রলেপ।

তারপর ধীরে ধীরে বিছানার দিকে তাকাতেই দেখল তার ওপর একটা ঘুমন্ত দেহের রেখা ক্রমে ক্রমে আকার নিল। তারপর অন্ধকারের মধ্যে অদ্ভুতভাবে সে বাড়তে লাগল। পরিস্কার দেখা গেল বিছানার সাদা চাদরের ওপর একটা লম্বা কালো মূর্তি।

মনে মনে হাসল ম্যারিয়ট। ফিল্ড একটুও নড়েনি। কয়েক মুহূর্ত তাকে দেখে ম্যারিয়ট আবার বইয়ের কাছে ফিরে এলো।

একটানা বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে। বাইরে গাড়ির কোন শব্দ নেই, তবে দুধের গাড়ি চলার সময় এখনো হয়নি। ম্যারিয়ট পড়া করতে লাগল। ঘুম আসছিল বলে মাঝে মাঝে ঘুম তাড়াবার জন্য একটা কফির কাপে চুমুক দিচ্ছে। তারই মধ্যে ফিল্ডের গভীর নিঃশ্বাস তার কানে আসছে।

বাইরে তখনও ঝড় থামেনি। সঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি। ঘরের মধ্যে নিঃসীম নিস্তব্ধতা। টেবিল ল্যাম্পের আলো টেবিলে ছড়িয়ে আছে, বাকি ঘরের সবটাই অন্ধকারাচ্ছন্ন। ছোট শোবার ঘরটা-যেখানে ফিল্ড শুয়ে আছে সে যেখানে বসে আছে ঠিক তার উল্টো দিকে, তার পড়ায় ব্যাঘাত ঘটাবার মতো কিছুই নেই, তবে মাঝে মাঝে ঝড়ের ঝাপটা জানালার ওপর পড়ছে আর হাতে সামান্য একটু ব্যথা অনুভব করছে।

এই ব্যথাটা যে কি করে হলো তা সে কিছুতেই বুঝতে পারছে না, বেশ টনটন করছে। ম্যারিয়ট মনে করবার চেষ্টা করছে, কেমন করে, কখন এবং কোথায় তার হাতে ধাক্কা লেগেছিল কিন্তু কিছুই ভেবে পাচ্ছে না।

নিচে রাস্তায় গাড়ির শব্দে সে সম্বিৎ ফিরে পেল। ঘড়ির দিকে তাকালো। ভোর চারটে। ম্যারিয়ট চেয়ারে হেলান দিয়ে বিরাট হাঁ করে হাই তুলল। তারপর উঠে জানালার পর্দাগলো সরিয়ে দিল। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। বাইরে ঘন কুয়াশায় দৃষ্টি চলে না। ব্রেকফাস্টের আগে সোফায় শুয়ে বাকি চার ঘন্টা ঘুমিয়ে নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ম্যারিয়ট। কিন্তু তখনও সেই শোবার ঘরটা থেকে গভীর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আর একবার নিঃশব্দে আধখোলা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে ভোরের মৃদু আলোয় বিছানাটা পরিস্কার দেখতে পেল। বিছানায় কেউ নেই। একবার চোখটা কচলে নিল ভাল করে। আবার ম্যারিয়ট চোখ কচলে নিয়ে চোখ বড় বড় করে সেদিকে তাকিয়ে রইল। অবাক বিস্ময়ে তার মুখটা হাঁ হয়ে গেল। বিছানা শূন্য, ঘরেও কেউ নেই।

ফিল্ডের প্রথম আবির্ভাবে যে ভয় ম্যারিয়টের মনে জেগে উঠেছিল সেই ভয় হঠাৎ যেন সে আবার অনুভব করতে লাগল। এবার যেন আরও বেশি। সেই সঙ্গে সে

সচেতন হয়ে উঠল তার বাঁ হাতটা দপদপ, টনটন করছে, আরো বেশি সে যন্ত্রণা বোধ করছে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল ম্যারিয়ট। চিন্তা করার শক্তি ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলেছে। আপাদমস্তক ঠকঠক করে কাঁপছে।

অনেক চেষ্টায় সে মনে বল এনে সাহসের সঙ্গে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। দেখল, বিছানার ওপরে যেখানে ফিল্ড শুয়ে ঘুমিয়েছিল সেখানে দেহের চাপ পড়ে একটা ছাপ তৈরি হয়েছে। বালিশে মাথা রাখার দাগ, নিচের দিকে বিছানার যেখানে বুটজুতো পরা পা রেখেছিল সেখানটা গর্ত হয়ে গেছে। আর সে বিছানার এতো কাছে ছিল যে পরিস্কার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল।

ম্যারিয়ট হঠাৎ চিৎকার করে তার বন্ধুর নাম ধরে ডাকতে লাগল-'ফিল্ড! তুমি কোথায়? তুমি কি বাথরুমে গেছ? কোথায় তুমি?'

কোন সাড়া নেই। বিছানা থেকে তখনও নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল! ম্যারিয়টের নিজের গলার আওয়াজ নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকছে। আর সে ডাকল না। হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার ওপরে নিচে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখ। শেষে তোষক তুলে ফেলল, একটার পর একটা চাদর তুলে দেখতে লাগল। যদিও ফিল্ডকে দেখা যাচ্ছিল না তবু সে তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে লুকিয়ে থাকতে পারে। দেওয়ালের কাছ থেকে খাটটা টেনে নিয়ে এলো তবু শব্দটা সেখান থেকে অবিরাম আসতে লাগল।

এই ক্লান্তিকর অবস্থায় ম্যারিয়ট মাথাটা ঠিক রাখা চেষ্টা করছিল, কিন্তু বারবারই সে টালমাটাল হয়ে যাচ্ছিল। সামলাতে পারছিল না নিজেকে। সে তন্ন তন্ন করে সমস্ত ঘর, বাথরুম খুঁজে দেখল। কোথাও কারও চিহ্ন নেই। ঘরের ওপর দিকে ছোট জানালাটা বন্ধ। তবে ওটা বেড়াল যাবার মতও চওড়া নয়। বসার ঘরের দরজাটা ভেতর দিক থেকে বন্ধ। সেপথ দিয়ে ফিল্ড বেরিয়ে যেতে পারে না। অদ্ভুত সব চিন্তা ম্যারিয়টের মনকে অস্থির করে তুলল। ভেতরটা তার তোলপাড় হয়ে যাচ্ছিল। আবার সে বিছানা উল্টেপাল্টে ভালো করে দেখল। দুটো ঘর, বাথরুম আবার খুঁজে এলো। না, কোথাও কিছু নেই। সে দরদর করে ঘামছিল। ঘরের কোণে বিছানায় যেখানে ফিল্ড শুয়েছিল সেখান থেকে তখনও নিঃশ্বাসের শব্দ ভেসে আসছিল।

তখন সে অন্যভাবে চেষ্টা করল। খাটটা যেখানে ছিল, সেখানে টেনে এনে সেই বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল। শোবার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে সে বিছানা ছেড়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিঃশ্বাসটা একেবারে তার গালের ওপর পড়ছে-

দ্রুত ম্যারিয়ট পড়ার ঘরে ফিরে গিয়ে সবকটা জানালা খুলে দিল। ঘরে আলো হাওয়া খেলতে লাগল। আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটা ধীরে সুস্থে চিন্তা করার চেষ্টা করল। সে জানত, যারা খুব বেশি পড়াশোনা করে এবং কম ঘুমোয়, তাদের মনে নানা অলীক, অবাস্তব চিন্তা জেগে উঠে যন্ত্রণা দেয়। আবার মনকে সে শান্ত করে রাতের ঘটনাগুলো পরপর বিশ্লেষণ করেও কোনো কূলকিনারা পেল না।

এসব খতিয়ে দেখে আর বিশ্লেষণ করতে করতে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হঠাৎ তার মনে উদয় হলো। ফিল্ড কিন্তু একবারও মুখ দিয়ে একটাও শব্দ বার করেনি! তার ভাবনা-চিন্তাকে ঠাট্টা করার জন্য তখনও ভেতরের ঘর থেকে দীর্ঘ গভীর ও স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের শব্দ আসছে! একটা অবিশ্বাস্য অযৌক্তিক ব্যাপার!

ভুতুড়ে চিন্তার জালে জড়িয়ে পাগলের মতো মাথার টুপি ও গায়ে বর্ষাতি চাপিয়ে বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে পড়ল। সকালের বিশুদ্ধ বাতাস, গাছ-গাছালির বুনো গন্ধ, আর স্যাঁতসেতে ভিজে মাটির ওপর ঘুরে বেড়িয়ে যখন সে বুঝতে পারল, মন থেকে ভয় দূর হয়েছে, খিদেও পেয়েছে বেশ, তখন সে বাড়ি ফিরে এলো।

ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল একজন লোক জানালায় হেলান দিয়ে রয়েছে। তাকে দেখে ম্যারিয়ট প্রথমটায় চমকে উঠলেও পরে তাকে চিনতে পারল। এ তার বন্ধু গ্রীণ-তার সঙ্গে পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

সে বলল, 'সারারাত খুব পড়েছ, ম্যারিয়ট। ভাবলাম, তোমার নোটগুলো মিলিয়ে নিই, আর ব্রেকফাস্টটাও করি। তাই তোমার কাছে চলে এলাম। তুমি এতো সকালে কোথায় গেছিলে? বাইরে?'

ম্যারিয়ট বলল, 'মাথাটা ধরেছিল, তাই একটু বেড়িয়ে এলাম।'

'ও!' গ্রীণ এর কণ্ঠে বিস্ময়। আর তখুনি একজন পরিচারিকা ঘরে ঢুকে গরম গরম পরিজ টেবিলে রেখে বেরিয়ে গেল। গ্রীণ বলল, 'ম্যারিয়ট, তোমার মদে আসক্ত বন্ধু আছে বলে জানতাম না তো?'

নীরস সুরে ম্যারিয়ট বলল সে নিজেও তা জানে না।

'মনে হচ্ছে বিছানায় কেউ আরামে ঘুমিয়ে আছে, তাই না?' মাথা নেড়ে ছোট শোবার ঘরটা দেখিয়ে কৌতূহলী হয়ে ম্যারিয়টের দিকে তাকিয়ে রইল।

দুজনে কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে সাগ্রহে ম্যারিয়ট বলল, 'তাহলে তুমিও শুনেছ? ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'নিশ্চয়ই আমি শুনেছি। দরজা খোলা রয়েছে। আমি যে ঘরে ঢুকে পড়েছি তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

'না, না। আমি কিছু মনে করিনি।' ম্যারিয়ট নিচু স্বরে বলল, 'এখন আর আমার ভয় করছে না। আমাকে ব্যাপারটা বলতে দাও। ভেবেছিলাম আমার মাথার কোন গোলমাল হয়েছে। তুমি জানো, এই পরীক্ষার ওপর আমার অনেক কিছু নির্ভর করছে। অথচ আমি পড়ায় মন বসাতে পারছি না। সাধারণত কোন শব্দ, দৃশ্য অথবা অলৌকিক চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকলে এমনটা হতে পারে কিন্তু আমি...বাজে যত্তোসব!'

তার কথার মাঝে হঠাৎ গ্রীণ বলল, 'তুমি কিসের কথা বলছ?'

শান্তস্বরে ম্যারিয়ট বলল, 'আমার কথা শোন, গ্রীণ। আমি যা বলতে চাই, তোমাকে আমি পরপর বলে যাব-তুমি কোন বাধা দেবে না।' রাতে যা যা ঘটেছিল সবিস্তারে বলল ম্যারিয়ট। হাতের ব্যথার কথাটাও বাদ দিল না। বলা শেষ হলে টেবিল

থেকে উঠে সে ঘরের ওপাশে গেল। বলল, 'এখন তুমি স্পষ্ট নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছ তো? তাই না?'

গ্রীণ ঘাড় নেড়ে বলল, 'হুঁ! বেশ, এবার এসো আমার সঙ্গে, আমরা দুজনে ভালো করে ঘরটা খুঁজে দেখব।' গ্রীণ কিন্তু চেয়ার থেকে নড়ল না! শুধু নিস্ক্রিয়ভাবে বলল, 'আমি আগেই ওখানে খুঁজে এসেছি। আমি শব্দ শুনে ভেবেছিলাম যে তুমি। দরজা হাট করে খোলা ছিল, তাই ভেতরে ঢুকেছিলাম।'

ম্যারিয়ট কোন মন্তব্য না করে দরজাটা ঠেলে একেবারে খুলে দিল। দরজাটা খুলতেই নিঃশ্বাসের শব্দটা আরো জোরে এবং পরিস্কারভাবে হতে লাগল। 'কেউ নিশ্চয়ই ওখানে আছে।' চাপা স্বরে গ্রীণ বলল।

'কেউ ওখানে আছে, কিন্তু কোথায়?' ম্যারিয়ট বিস্মিত হয়ে বলল। আবার তার সঙ্গে ঘরে ঢোকবার জন্য জেদ ধরল। গ্রীণ সরাসরি তা প্রত্যাখান করে বলল সে একবার ঘরে ঢুকে ভালো করে খুঁজে দেখেছে, কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পায়নি। অতএব সে আর ভেতরে যাবে না।

ওরা দরজা বন্ধ করে দিয়ে বসার ঘরে ফিরে এলো। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। ম্যারিয়ট বলল, 'সঠিক এবং যুক্তিসংগত একমাত্র যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তা হলো আমার হাতের ব্যথাটা। হাতটায় প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। কখন যে চোট লেগেছিল কিছুই মনে করতে পারছি না।'

গ্রীণ বলল, 'দেখি তো তোমার হাত।' ম্যারিয়ট কোটটা খুলে জামার হাতাটা গুটিয়ে ফেলল।

'হায় ঈশ্বর! এযে দেখছি রক্ত!' সে চিৎকার করে উঠল। 'দেখ, দেখ, এটা কি?'

হাতের কব্জির কাছাকাছি একটা সরু লাল দাগ! তার ওপরে টাটকা রক্তের ফোঁটা। গ্রীণ কাছে এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ সেটা খুঁটিয়ে দেখল। তারপর চেয়ারে বসে কৌতূহলী দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখ দেখতে লাগল।

'সে মন্তব্য করল 'অজান্তেই' তুমি নখের আঁচড় কেটেছো।'

'কোন চিহ্ন নেই তো। নিশ্চয়ই অন্য কোন কারণে আমার হাতে এমন ব্যথা হচ্ছে।'

ম্যারিয়ট নিশ্চল হয়ে বসে একদৃষ্টে হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। মনে হচ্ছে যেন সব রহস্যের সমাধান হাতের চামড়ার ওপর লেখা আছে।

'কি ব্যাপার? একটা আঁচড়ে অদ্ভুত কিছু আমি দেখছি না-' নিরুত্তাপ স্বরে গ্রীণ বলল। 'আর ওটা হয়তো তোমার আস্তিনের বোতামের দাগ। গত রাতে উত্তেজনাবশত–'

ম্যারিয়টের ঠোঁট দুটো ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সে কথা বলার চেষ্টা করল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। অবশেষে সে তার বন্ধুর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ল।

মৃদু কম্পিত অনুচ্চ স্বরে সে বলল, 'দেখো, ঐ লাল দাগটা দেখছ? আমি বলতে চাইছি নিচের দিকে, যাকে তুমি আঁচড় বলছ?'

এবার গ্রীণ স্বীকার করল, কিছু যেন দেখেছে। ম্যারিয়ট রুমাল দিয়ে সেটা মুছে ফেলে আবার তাকে ভালো করে লক্ষ্য করতে বলল।

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে এটা একটা পুরানো ঘায়ের দাগ।'

'এটা একটা পুরানো ঘা!' ফিসফিস করে ম্যারিয়ট বলল। ঠোঁট দুটো তার কাঁপছে থরথর করে। 'এখন সব কিছু মনে পড়ছে।'

'সব কিছু কী?' চেয়ারে বসে অস্থির হয়ে গ্রীণ জিজ্ঞেস করল।

'চুপ! আস্তে! আমি তোমাকে বলব। এই ক্ষত ফিল্ডেরই কীর্তি!'

বিস্মিত হয়ে তারা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কারোর মুখে কোন কথা নেই।

'ঐ ক্ষত ফিল্ডেরই সৃষ্টি।' অবশেষে ম্যারিয়ট একটু উঁচু গলায় পুনরাবৃত্তি করল।

'ফিল্ড! তুমি বলছ-কাল রাতে?'

'না, কাল রাতে নয়-অনেক বছর আগে একটা ছুরি দিয়ে স্কুলে। আমরা একে অন্যের ক্ষত রক্ত দিয়ে বদল করেছিলাম। সে এককোঁটা আমার হাতে ফেলেছিল, আমিও এককোঁটা তার-।'

'হায় ঈশ্বর, কিসের জন্য?'

'এটা একটা নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন। আমরা পবিত্র অঙ্গীকার করেছিলাম, একটা চুক্তি। আমার এখন সব স্পষ্ট মনে পড়ছে। আমরা ভূতের গল্পের বই পড়তাম এবং শপথ করেছিলাম যে আগে মারা যাবে সে অন্যকে দেখা দেবে। আমার পরিস্কার মনে আছে-আজ থেকে সাত বছর আগে, এক ভীষণ গরমের দুপুরবেলায় খেলার মাঠে এবং একজন শিক্ষক আমাদের ধরে ফেলেন আর ছুরি কেড়ে নেন-'

'তাহলে তুমি বলতে চাইছ-' গ্রীণ তোতলাচ্ছে।

ম্যারিয়ট কোন উত্তর দিল না। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে সোফার ওপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল। দুহাতে ঢাকল মুখ।

গ্রীণ নিজেও একটু হতবাক হয়ে গেছে। সে একা একা সমস্ত ব্যাপারটা আবার চিন্তা করতে লাগল। একটা ধারণ তার মাথায় এলো, সে ম্যারিয়টের কাছে গিয়ে তাকে সোফা থেকে তুলল। 'আমি বলি কি ম্যারিয়ট, এতে এত ঘাবড়ে যাওয়ার কিছু নেই। এটা অলীক কিছু হলে আমরা জানি কি করতে হবে। আর তা যদি না হয়, তবে আমরা বিষয়টিকে নিয়ে অন্য ভাবে চিন্তা করব, তাই না?'

ফ্যাকাসে মুখে গ্রীণের দিকে তাকিয়ে ম্যারিয়ট বলল, 'আমার মনে হয় তাই। কিন্তু আরেকটা কথা ভেবে আমি খুব ভয় পাচ্ছি। ঐ বেচারা আত্মা-'

'ঐ লোকটা তার প্রতিজ্ঞা রেখেছে-ব্যস, ব্যাপারটা মিটে গেল তাই না?'

ম্যারিয়ট মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

গ্রীণ বলল, 'আচ্ছা, একটা জিনিস কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না, তুমি কি নিশ্চিত যে সত্যিই সে খাওয়া দাওয়া করেছিল?'

ম্যারিয়ট কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকে দেখে জানাল যে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই। সে শান্তভাবে কথা বলছিল। বলল, 'আমাদের খাওয়া শেষ হলে আমি নিজের হাতে সেগুলো সরিয়ে রেখেছি। ঐ আলমারীর তৃতীয় তাকে পাত্রগুলো রাখা আছে। চেয়ারে বসেই ম্যারিয়ট দেখাল। গ্রীণ উঠে গিয়ে পাত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখে মন্তব্য করল, 'যা ভেবেছি! এটা নিছকই মনের কল্পনা। খাবারগুলো কেউ ছোঁয়নি। এদিকে এসো, নিজের চোখে দেখে যাও।'

তারা দুজনে তাকটা পরীক্ষা করে দেখল। বাদামী রঙের পাউরুটি পড়ে আছে, থালায় বাসি কেক, পাত্রে কমলালেবুর আচার-যেমন রাখা হয়েছিল, তেমনি পড়ে রয়েছে, কেউ স্পর্শও করেনি। এমনকি ম্যারিয়টের গেলাস ভর্তি মদও আগের মতই রয়েছে।

গ্রীণ বলল, 'তুমি কাউকে খাওয়াওনি, ফিল্ড কোন খাবারও খায়নি, কিছু পানও করেনি। সে এখানে মোটেই ছিল না।'

'কিন্তু নিঃশ্বাস?' চাপা গলায় ম্যারিয়ট জানতে চাইল।

গ্রীণ উত্তর দিল না। সে ছোট শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। ম্যারিয়টের দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করল। সে দরজা খুলে কান পেতে কিছু শুনল। কথা বলার দরকার হলো না। গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ অবিরাম ভেসে আসতে লাগল। ম্যারিয়ট যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সামনের পড়বার ঘরে-সেখানেও শুনতে পাচ্ছিল শব্দটা।

গ্রীণ দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো। সে এই বলে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করল, একটা কাজই করবার আছে। বাড়িতে চিঠি লিখে ফিল্ড সম্বন্ধে তুমি জেনে নাও। আর এ কদিন আমার ঘরে থেকে তোমার পড়াশোনা চালিয়ে যাও। আমার আলাদা বিছানা আছে, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

'বেশ রাজি আমি। এবার আমাকে পাশ করতেই হবে।'

এ ঘটনার এক সপ্তাহ পরে ম্যারিয়ট তার বোনের কাছ থেকে চিঠির উত্তর পেয়েছিল। চিঠির কিছু কিছু অংশ সে গ্রীণকে পড়ে শুনেছিল, তার বোন লিখেছিল-

... তুমি ফিল্ডের ব্যাপারে জানতে চেয়েছ। কিছুদিন আগে কপর্দকশূন্য অবস্থায় তাকে তার বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সে কোথাও না গিয়ে বাড়ির বেসমেন্টে আশ্রয় নেয়। ধীরে ধীরে অনশন করে প্রাণত্যাগ করে। ...ওর বাড়ির লোকেরা ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। আমাদের বাড়ির পরিচারিকার কাছে একথা শুনেছি, সে আবার তাদের দারোয়ানের মুখে শুনেছে। ১৪ তারিখে ফিল্ডের মৃতদেহ দেখতে পায় তারা। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে বারো ঘন্টা আগে তার মৃত্যু ঘটেছে। ...ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল ফিল্ডকে...।

গ্রীণ ঢোক গিলে বলল, 'তাহলে সে ১৩ তারিখেই মরেছে?'

ম্যারিয়ট বলল, 'হুঁ।'

'ঠিক ওইরাতে সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল!'

ম্যারিয়ট আবার মাথা ঝাঁকাল।

দ্য টপ কোট
পিটার টিউনিস উড

টপ কোটটা লালচে টুইডের। কোটটা ঝোলানো ছিল স্টাফ-ঘরের দরজার পিছনে একটা পুরনো পিতলের হুকের সঙ্গে। কোটটার কলারের উপরের দিকে সবুজ লাইনিং বেরিয়ে এসেছে। আলগা লাগানো পকেটের কোণ থেকে সুতো দেখা যাচ্ছিল। বেল্টের বকলসটা বাঁকা।

সবই মনে আছে আমার। মনে আছে কাৎজকে ও তার দপ্তরের কথাও।

কাৎজ-এর টাক মাথা, ছলছলে চোখ, গলায় বো-টাই। তার ব্রিফকেসটাই তার দপ্তর যেন। ছাত্রদের দেওয়া খাবারে সেটা ফুলে থাকত। উপরের দিকের খাবারগুলো টাটকা; নিচেরগুলো পচা। চোখ ঘুরিয়ে, ফ্যাকাসে নাকের ফুটো ফুলিয়ে কাৎজ বলত, 'এগুলো আমার ছাত্রদের দেওয়া খাবার ব্র্যান্ডন।' বলেই ব্রিফকেসের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো পচা মাংসের কাবাব তুলে দেখাত।

আমি যখন জার্মানীতে শিক্ষকতা করতে যাই তখন সেখানকার দিনকাল খুবই খারাপ যাচ্ছিল। আমার দুই ছাত্র ফিৎজ ও ফ্রলিমশ্নি-র কথা বেশ মনে পড়ে। পানিতে ডুবে তারা মারা যায়। ফ্রাউ লিৎনারকেও মনে পড়ে। সে ছিল আমাদের স্কুলের সেক্রেটারি। সুন্দর কালো চুল, সরু কোমর আর শক্ত পা।

মনে পড়ে পেতিৎ জাঁ, টম বেইলি, তিলি, ফ্রাউ গ্রোৎস ও ইংরেজির প্রধান অধ্যাপক স্মিস-এর কথা। তার ছিল পর্তুগীজ পাসপোর্ট; সে উচ্চারণ করতে পারত না। তাদের কথা মনে পড়লে ভালোই লাগে।

টপ কোটটার কথাও মনে পড়ে। আর মনে হলেই ছমছম করে ওঠে গা।

যেদিন প্রথম আমি সেই জার্মান শহরটিতে যাই সেদিন ফ্রাউ লিৎনারই আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করেছিল-হের ব্র্যান্ডন?

করমর্দন শেষে আমাকে নিয়ে একটা বুফেতে গিয়ে কফির অর্ডার দিল।

'ইংল্যান্ড থেকে আসতে কষ্ট হয়নি তো?' সে বলল।

'না।'

তার বিবর্ণ সবুজ চোখে একটা বিষন্নতার ছায়া পড়ল। ধীরে ধীরে মাথাটা নেড়ে সে একটু হাসল।

বলল, 'আমাদের স্কুল আপনার ভালো লাগবে না, হের ব্র্যান্ডন।'

'তাই নাকি?'

'এখানে কেউ বেশিদিন থাকে না।'

'কেন?'

সে আবার হাসল! বলল, 'কফিটা শেষ করে আমার সঙ্গে চলুন।'

পাথুরে রাস্তায় তার পেছন-পেছন হাঁটতে লাগলাম। লোহার বারান্দা থেকে মাদুর ঝুলছে। শিকারীর দল ঘোরাঘুরি করছে বাইরে। তাজা 'সেমলন' ফুলের গন্ধে বাতাস ভারি।

একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে দেওয়ালের পেতলের নাম-ফলকটা আমাকে দেখাল ফ্রাউ লিৎনার। তাতে লেখা–

"ক্রেৎসমার-এর বিদেশি ভাষা শিক্ষা প্রাইভেট একাডেমি।"

মুখ ঘুরিয়ে সে আমার দিকে তাকাল। ম্লান সবুজ চোখে হঠাৎ আলোর ঝলকানি।

'এই পথে আসুন' বলে স্যাঁতসেতে উঠোন পেরিয়ে, দু'ধাপ নিচু সিঁড়ি বেয়ে একটা চওড়া বারান্দা ধরে এগিয়ে আমাকে নিয়ে সে ছোট হল ঘরটার দিকে চলল।

ঘরে একেবারে শেষ প্রান্তে দুই পাল্লার কাঁচের দরজা। তার পেছনেই ক্রেৎসমার-এর প্রাইভেট একাডেমি। ফ্রাউ লিৎনারের সঙ্গে ঢুকলাম।

একটা সরু বারান্দার শেষের দরজাটা দেখিয়ে সে বলল, 'ওটাই স্টাফ ঘর।'

সে আমার কাঁধের উপর হাত রাখল। আমি মুখ ফিরিয়ে তার ম্লান সবুজ চোখের দিকে তাকালাম। সে চোখে পলক পড়ছিল না। তার আঙুলগুলো আমার বাহুর ওপর ক্রমেই চেপে বসেছে। তার শক্ত হাঁটুটা আমার পায়ের গুলির উপর চাপ দিচ্ছে।

একটা অজ্ঞাত শক্তি যেন আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। আমি অসহায়ভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একমুহূর্ত পরেই সে শক্তি উধাও হয়ে গেল।

সে ধীরে ধীরে বলল, 'হের ব্র্যান্ডন, এখানে আপনার ভালো লাগবে না।'

হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে সে সেখান থেকে চলে গেল। একবারও ফিরে তাকাল না।

একটা সিগারেট ধরালাম, ধীর পায়ে হেঁটে গেলাম বারান্দায়, তারপর স্টাফ ঘরের দরজাটা হাত দিয়ে ঠেলে খুলে ফেললাম।

টম বেইলি মুখ তুলে তাকাল। পেতিৎজাঁ টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে মুখ-ভর্তি খাবার নিয়ে মাথা নাড়ল। কাৎজ চোখ ঘোরালো, আর ফ্রাউ গ্রোৎস এককোণে বসে নাক ডাকতে লাগল।

একঝলক বাতাস ঘরে ঢুকল জানালা দিয়ে। টেবিল থেকে উড়ে গেল কতগুলো ভাজা মরিচ। সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। টুইডের লালচে কোটটা মেঝেতে পড়ে গেল। ওটা তোলার জন্য আমি ঝুঁকলাম।

'যীশুর দোহাই, ওতে হাত দেবেন না।'

ভয়ার্ত কণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকারে আমার গায়ে কাঁটা দিল।

সোজা হয়ে ঘুরলাম।

টম বেইলির মুখ সাদা। পেতিৎজাঁর হাঁ-করা ঠোঁট ঝুলে পড়েছে। কাৎজ-এর হাত কাঁপছে। ফ্রাউ গ্রোৎস নিজের চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে আছে।

'ও কোটটাতে কখনো হাত দেবেন না।' টম বেইলি বলল। তার গলা আতঙ্কে কাঁপছে।

সকলেরই চোখে মুখে ভয়ের ছাপ।

টম বেইলি কঠিন স্বরে বলল, 'ককখোনো না, ককখোনোই না।'

দরজাটা খুলে গেল। ফ্রাউ লিৎনার ঘরে ঢুকল। আমার নতুন সহকর্মীদের দিকে তাকাল। তারপর আমার দিকেও চাইল। কোটটার দিকে চোখ ফেরাল। তারপর মৃদু হাসতে লাগল। কেমন যেন বাঁকা হাসি। বিষণ্নতা আর তিক্ততায় ভরা।

হাসতে হাসতে উপুড় হয়ে কোটটা তুলে নিয়ে আবার সেই আঁচড় লাগা পিতলের হুকে ঝুলিয়ে রাখল। তারপর বলল, 'আপনারা সকলেই আছেন দেখছি।'

'আচ্ছা টম, এই কোটটা কার?'

টম বেইলি পেতিৎজাঁর দিকে তাকাল। ফরাসী ভদ্রলোকটি কাঁধ ঝাঁকাল। তার কাস্তের মত কালো গোঁফ চকচক করছে।

আমি বললাম, 'দেখ, আজ মাস দুই হলো আমি এখানে এসেছি, যখনই কোটটার কথা বলি, কোটটার দিকে তাকাই, ওই কোটটার কাছাকাছি যাই, তখনই তোমরা সকলে ভয়ে আঁতকে ওঠো। ঘটনা কী?'

সরাইখানার পেছনের ঘরটাতে আমরা বসেছিলাম। শীতকাল। আবহাওয়া বেশ খারাপ। বরফে চাপা পড়ে অরণ্যভূমি আর্তনাদ করছে। মাসের শেষ। আমাদেরও পকেট গড়ের মাঠ। পেটমোটা চুল্লি খাঁ খাঁ করে জ্বলছে।

আমাদের পেটে ছুঁচোয় ডন মারছে। গত তিনদিন কোন গরম খাবার আমাদের কপালে জোটেনি। আরও দুটো দিন না গেলে জুটবেও না।

আমি বললাম, 'তারপর? কোটের ব্যাপারটা কে আমাকে বলবে?' তিলি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'ঠিক আছে, বলছি। কোটটা ছিল মর্গানের।'

'মর্গান?'

'বছর তিনেক আগে সে এখানকার শিক্ষক ছিল। আমরা কেউই-'

'না, চুপ করো।' টম বেইলি বাধা দিল। তার চেহারায় উদ্বেগ।

'বলে যাও তিলি,' আমি দৃঢ় স্বরে আদেশের ভঙ্গিতে বললাম।

তিলি পেতিৎজাঁর দিকে তাকাল; সে ঘাড় নাড়ল।

তিলি এবার বলতে শুরু করল– 'আমরা কেউ তাকে চিনতাম না। আমাদের আগে থেকে সে এখানে ছিল। অবশ্য কাৎজ তাকে চিনত। লোকটা চুপচাপ থাকত, তেমন কথাবার্তা বলত না। প্রায়ই মদে বুঁদ হয়ে থাকত। সকলের সামনে মদ খেত না।

লুকিয়ে খেত। মজার ব্যাপার এই যে, সে কখনও তার টপ কোটটা গা থেকে খুলত না। গ্রীষ্মকালেও গায়ে দিয়ে থাকত। এমন কি পড়াবার সময়েও।' কাৎজ বলে, 'কোটের পকেটে সে একটা রূপোর ফ্লাস্ক রাখত। যখনই টের পেত কেউ তাকে লক্ষ্য করছে না তখনই ফ্লাস্ক থেকে পান করত।' তিলি থামল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর?'

'একদিন রাতে-বছরের ঠিক এই সময়টাতে-সে সত্যি মাতাল হয়ে পড়ল। ফ্রাউ লিৎনার তাকে সামাল দেয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু সে ঘরময় দাপিয়ে বেড়াতে লাগল। একসময় ফ্রাউ লিৎনারের গালে চড় মেরে ঝড়ের বেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

পুরো তিনদিন তার টিকিটিও দেখতে পেল না কেউ!

অবশেষে তাকে পাওয়া গেল জঙ্গলের মধ্যে একটা নালার ভেতর উলঙ্গ অবস্থায়। এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত কাটা।'

টম বেইলি কাঁপতে লাগল।

'দিন চারেক পরে স্কুলে একটা পার্সেল এলো। ফ্রাউ লিৎনারই সেটা খুলল। তার ভিতরে ছিল টপ কোটটা! ফ্রাউ লিৎনার কিছুই বলল না; স্টাফ ঘরের দরজার পিছনে কোটটা সে ঝুলিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল।'

'রীস নামে একজন ওয়েলশ শিক্ষক ওখানে ছিল। সে সবসময় চুপচাপ থাকত। সেও আমাদেরই মতো পেটের দায়েই চাকরী করতে এসেছিল। একদিন রাতে সে কোটটা নিল। এপর থেকে তারও কোন খোঁজ নেই। দিন চারেক পরে কোটটা ফেরত এলো। ফ্রাউ লিৎনার সেটাকে দরজায় ঝুলিয়ে রাখল।'

'তারপর গত বছর বল্ডুইনের বেলাতেও সেই একই ঘটনা ঘটল।' টম বেইলি বলল, 'তখন আমরা সবাই এখানেই ছিলাম। কাৎজ যখন তাকে কোটটা নিতে নিষেধ করল তখন আমরা তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাই নি।'

তিনি বলল, 'তার কথা শুনে আমরা তো হেসেই খুন।'

টম বেইল বলল, 'বল্ডুইনও হেসেছিল। একদিন রাতে কোটটা নিয়ে বলল- 'চায়ের দোকান থেকে একটু ঘুরে আসছি।''

তিলি শান্ত স্বরে বলল, 'তাকে আর কোনদিন দেখা যায় নি। চারদিন পরে কোটটা ফেরত এলো।'

'ভয়ঙ্কর। খুব্ ভয়ঙ্কর।' টম বেইলি বলল।

হঠাৎ চুল্লিটা গর্জন করে উঠল। তার সামনে শুটকো কালো বেড়ালটা নড়েচড়ে বসল। তার লেজের ডগায় কয়েকটা লালচে ফুটকি।

আমি কোনমতে বললাম 'এইজন্যেই তোমরা কেউ এটাকে ছোঁও না?'

টম বেইলি ও তিলি মাথা দোলাল।

'কিন্তু ফ্রাউ লিৎনার?' তাকে তো এটাতে হাত দিতে দেখেছি। তার কিছু হয় না কেন?' সবাই চুপ।

তিলি ও টম বেইলির চোখ আমার উপর থেকে সরে গেল। পেতিৎজাঁ ধীরে ধীরে তিলির বুকে টোকা দিতে লাগল।

আমি একগাল হেসে বললাম, 'তুমি আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছো।'

'না।' তিলি বলল। 'না।' পেতিৎজাঁর কাছ থেকে সরে এসে সে আমার দুই হাত চেপে ধরল।

'আমি সত্যি কথাই বলেছি। আমাকে কথা দাও, তুমি কখনও ঐ কোটটা ছোঁবে না। কথা দাও, আমাকে কথা দাও।'

'ঠিক আছে।' আমি বললাম।

এক ঘন্টা পরে তিলি পেতিৎজাঁর সঙ্গে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে আমার কপালে চুমু খেল। টম বেইলি ফ্রিৎজকে ডাকল। ফ্রিৎজ ও ফ্রনিশ্নি ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে ছিল। ফ্রিৎজকে দিয়ে আর এক গ্লাস 'স্ন্যাপ' (পানীয়) আনিয়ে এক চুমুকে সেটা শেষ করে টম বেইলি। রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

আমি সোজা দাঁড়িয়ে তাদের দুজনের দিকে এগিয়ে যেতে টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। ফ্রিৎজ লাফ দিয়ে উঠে একটা চেয়ার এনে সসম্ভ্রমে আমাকে বসিয়ে দিল। তারপর চশমা খুলে জ্যাকেটের আস্তিনে কাঁচটা সজোরে ঘষতে ঘষতে বলল, 'হের ব্র্যান্ডন, আপনাকে কিছু বলতে চাই।'

আমি বললাম, 'বলে ফেলো চটপট।'

ফ্রিৎজ চোখ মিটমিট করল। তাকাল। জিভ দিয়ে বারকয়েক ঠোঁট চাটল। তারপর বলল, 'আজ রাতে ফ্রাউলিনশ্নি ও আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাব।'

থুতনিটা বুকের কাছে নামিয়ে ওদের দিকে তাকালাম। কিছুই বললাম না।

ফ্রিৎজ গলা খাঁকারি দিয়ে মোটা ফ্রাউলিনের হাতটা ধরল। আমার দিকে মিনতি ভরা চোখে তাকাল। 'দেখুন,' সে বলল। 'দেখুন।'

আমার মুখে মৃদু হাসি ফুটল। টেবিল ছেড়ে সিধে হলাম।

বাইরে নির্মম ঠাণ্ডা। হাড় কনকনে শীত।

স্ন্যাপের ধোঁয়া তাড়ানোর জন্য মাথাটা নাড়তে লাগলাম। মুহূর্তের জন্য বমির ভাব দেখা দিল। মাথাটা ঘুরে যেতেই দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। আর তখনই সেটা চোখে পড়ল।

স্কুলের জানালায় একটা আলো। সেই আলোয় একটি নারীমূর্তি। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য সেই ছায়ামূর্তি দেখতে পেলাম। তারপরেই সেটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

মুহূর্তের মধ্যে আমার মাথা পরিস্কার হয়ে গেল।

তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হয়ে, উঠোন পেরিয়ে, দুই ধাপ সিঁড়ি বেয়ে স্কুলের কাঁচের দরজাটা সপাটে খুলে ফেললাম।

গাঢ় অন্ধকার। নিচ্ছিদ্র নীরবতা। চিৎকার করে বললাম– ওখানে কেউ আছো?

কোন উত্তর নেই।

চারিদিকে তাকালাম। স্টাফঘরের দরজার নিচ দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছে। আমার বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করতে লাগল। সাবধানে বারান্দা ধরে এগোলাম। দরজার বাইরে থামলাম। তারপর হঠাৎ দরজার কাঁধ লাগিয়ে ধাক্কা মেরে সেটাকে খুলে ফেললাম।

আমার সামনেই মেঝেতে পড়ে আছে লালচে টপ কোটটা। ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল, আমার পিছনের দরজায় ঝুলছে ফ্রাউ লিৎনারের টাইরোলীয় টুপি ও স্কার্ট। আর্তনাদ করে উঠলাম, 'ফ্রাউ লিৎনার! ফ্রাউ লিৎনার।'

কোন সাড়া নেই।

ফ্রাউ লিৎনারের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে স্টাফ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তারপর পাগলের মতো ক্লাসরুম, বাথরুম, ছোট অফিসঘর, গুদাম, রান্নাঘর-সব একে একে খুঁজলাম।

আবার চিৎকার করে ডাকলাম, 'ফ্রাউ লিৎনার! ফ্রাউ লিৎনার!'

কোন সাড়া শব্দ নেই। প্রাণের কোন চিহ্ন নেই।

তারপরেই মনে হলো, কে যেন খুব ধীরে, খুব আস্তে আস্তে আমার বাহুর উপরে, আমার পায়ের গুলির উপরে চাপ দিচ্ছে!

মাত্র দু'মাস আগে যে শক্তি আমাকে ভর করেছিল আবার তাকে ফিরে পেলাম।

তার বিরুদ্ধে লড়াই করলাম। মাথার মধ্যে আমার কণ্ঠস্বর বাজতে লাগল। শরীরের মাংসপেশীগুলো সংকুচিত হতে লাগল। প্রতিটি স্নায়ু বিদ্রোহ ঘোষণা করছে।

আবার স্টাফ রুমে ফিরে গেলাম। লালচে টপ কোটটার উপর ঝুঁকলাম। সেটাকে তুলে নিয়ে গালের উপর ঘষতে লাগলাম।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম, 'ফ্রাউ লিৎনার... ফ্রাউ লিৎনার।'

আমার ভিতরকার শক্তি আরও আরও বেড়ে গেল। আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম।

ছুটে পথে নামলাম। টপ কোটটা আমার গায়ে। সেটাকে ছিঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করলাম। বৃথা চেষ্টা। একটা অজ্ঞাত শক্তি আমার শিরা-উপশিরার ভিতর দিয়ে দাপাদাপি করছে, কপালের ভিতর হাতুড়ি পিটছে, মাথার মধ্যে ভয়ার্ত কণ্ঠস্বরের গলা টিপে ধরছে। একটা কাঁপা দুধ-সবুজ আভা দিয়ে চারদিকের আলো ঢেকে দিচ্ছে; আর আমি একেবারেই অসহায়।

সে শক্তি ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। সে আমার মাথাটা ঘুরিয়ে দিল, আমাকে বাধ্য করল স্টাফরুমের আলোকিত জানালার দিকে তাকাতে।

সেখানে আবার সেই নারীমূর্তির রেখাচিত্র। আমি হাঁক ছাড়লাম-ফ্রাউ লিৎনার।

কোন সাড়া পেলাম না। একটা কথাও বলল না কেউ।

শহরের ভিতর দিয়ে হাঁটছি আমি।

শেষ ট্রামটা পাথুরে রাস্তা ধরে ডিপোতে ফিরে গেল। অবশেষে শহরের যে অঞ্চলে

পৌঁছলাম সেটা আমার কাছে অপরিচিত। তবু হাঁটতে লাগলাম। বাগানঅলা বড় বড় বাড়ি পার হলাম।

অবশেষে একটা ছোট পার্কে পৌঁছলাম। ফটক পেরিয়ে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত ছোটদের দোলনা ও টেনিস কোর্টের কুয়াশার ভিতর দিয়ে পা চালিয়ে দিলাম।

উঁচু লরেল গাছের বেড়ার ভিতরে একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে সেটার ভিতর দিয়ে গলে বাগানে পৌঁছে গেলাম। বাড়ির বাইরেটা যেন অন্ধকারে ওঁৎ পেতে আছে। ঘাসগুলো এলোমেলো বেড়ে উঠেছে। সূর্য-ঘড়িটার উপর একটা কালো পাখি ঠাণ্ডায় মরে পড়ে আছে।

আমার কাঁপুনি ধরল। এক উন্মাদ মুহূর্তে মনে হলো, এবার বুঝি টপ কোটটা খুলে ফেলতে পারব। কোটের বোতামগুলো ছিঁড়ে ফেললাম। আস্তিন ধরে টান দিলাম।

কিন্তু তক্ষুণি সেই শক্তিটা আবার আমার ওপর ভর করল; আমাকে বাড়িটার পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। পাথরের নুড়ির ওপর আমার পায়ের শব্দ। সামনের পোর্টিকোতে পৌঁছে গেলাম। কালো ওক কাঠের দরজার পাশে ঘন্টাটা ঝুলছে। বেল বাজালাম। সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। ভিতরে পা রাখলাম।

সব কিছু যেন বিষন্নতায় মোড়া।

সাদা চাদরে ঢাকা আসবাব চোখে পড়ল। কাঁচের ঝাড়লণ্ঠনের টুংটাং শব্দ কানে এলো। বাতাসে ধুলোর গন্ধ। সামনে চওড়া শ্বেতপাথরের সিঁড়ি।

'এদিকে, মেইন হের।'

লোকটি আমার ডানদিকে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কেমন চেনা চেনা লাগল কণ্ঠস্বরটা। তবে একটু ইতস্তত করছিলাম। 'দয়া করে এদিকে চলুন।'

আসবাবপত্রের স্তূপের ভেতর দিয়ে লোকটি এগিয়ে গেল। তাকে অনুসরণ করলাম। আর তখন মূর্তিটিকে চিনতে পারলাম।

কাৎজ।

বললাম, 'কাৎজ! তুমি এখানে কী করছ?'

সে মুখ ফেরাল না। শ্বেতপাথরের সিঁড়িটা পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করলাম। আয়না ও ক্লিমট-এর ছবি ঝোলানো চাতাল ধরে সে আমাকে নিয়ে চলল।

একটা দরজা খুলে মাথা নোয়ালো।

বলল, 'ভিতরে যান মেইন হের।'

থামলাম। বললাম, 'যীশুর দোহাই, এসব কি হচ্ছে কাৎজ?'

ঘরের ভেতর থেকে কে যেন ডাকল। 'দয়া করে ভিতরে আসুন।'

ফ্রাউ লিৎনারের গলা। আবার আহ্বান।

'এখানে এলে আপনার ভালো লাগবে। সব কিছু দেখে আপনি সন্তুষ্টই হবেন, হের মর্গান।'

ভিতরে ঢুকলাম। সে আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

একটা উজ্জ্বল আলোকক্ষেত্র ছাড়া সবই অন্ধকারে ঢাকা। সেই আলোক রশ্মিটা তার উপরেই পড়েছে।

ফ্রাউ লিৎনার। কিন্তু এ ফ্রাউ লিৎনারকে আমি আগে কখনও দেখিনি। টুপি নেই, চৌকো টর্চ নেই, মোটা জাম্পার নেই, পুরু পশমী মোজা নেই।

খোলা কাঁধের উপর কালো চুলের রাশি এলোমেলো ছড়ানো। পরনে তার লাল গাউন। দুই চোখে ঘন করে কাজল টানা। গালে পাউডার। ঠোঁটে একটা চকচকে পিচ্ছিল ভাব। সে এগিয়ে এসে আমার কোমর জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে লম্বা চুমো খেল।

একটা বরফের বর্শা যেন বিঁধল আমার পেটের মধ্যে। বরফের শলা ঢুকল গলার কাছটাতে।

ফ্রাউ লিৎনার বলল, 'স্বাগতম, হের মর্গান।'

আর্তনাদ করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না।।

পরক্ষণেই ঘরটা আলোয় আলোয় ভরে গেল।

বরফ-সাদা দেয়াল। বরফ-সাদা মেঝে। কয়লা-কালো চেয়ারের সারি।

পাকানো চামড়ার রশি দিয়ে চেয়ারগুলোর সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে আমার শহরের বন্ধু ও সহকর্মীদের-টম বেইলি, তিলি, অধ্যাপক স্মিস, ফ্রাউ গ্রোৎস, একাডেমির ডিরেক্টর, সকলকেই। ভয়ে তাদের মুখগুলি সাদা; চোখের পাতা যেন জমে গেছে; একটা পলকও পড়ছে না। সূর্যঘড়ির উপর মরে পড়ে থাকা কালো পাখিটার কথা মনে পড়ে গেল।

ফ্রাউ লিৎনার আমার শরীরটাকে চেপে দাঁড়াল। ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনি কাঁপছেন, হের মর্গান।'

তারপর মৃদু হেসে সে আমার টপ কোটের ডানদিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। একটা রূপোর ফ্লাস্ক বার করে ছিপিটা খুলে ফ্লাস্কটা আমার ঠোঁটে চেপে ধরে বলল, 'একটু পান করুন, হের মর্গান।' দুধ সবুজ তরল পদার্থ কিছুটা পান করলাম। ফ্লাস্কটা শেষ করলাম।

হাত ধরে সে আমাকে ঘরের মাঝখানে নিয়ে গেল। মনে হলো, আমি যেন ভেসে চলেছি। একটা ব্রোকেড ঢাকা ডিভানে আমাকে শুইয়ে দিল। একটা সুগন্ধি আরাম যেন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমার পাশে হাঁটু গেড়ে সে বসে পড়ল।

আমার গালের উপর তার নিঃশ্বাস পড়ছে। গলার উপর ছড়িয়ে পড়েছে তার দীর্ঘ কালো চুল। তার দেহের স্পর্শে উত্তপ্ত আমার দেহ।

সে বলল, 'চোখ বুজুন, হের মর্গান।'

আমার চোখ বুজে এলো। তার কাজে বাধা দেবার শক্তি আমার নেই।

সে ফিসফিস করে বলল, 'ভালো করে তাকান, হের মর্গান।'

বুজে থাকা চোখের পাতা খুলতে চেষ্টা করলাম। অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার।

'আরও বড় করে তাকান, হের মর্গান।'

বাজ পড়ার আওয়াজ দুই কানে। বুকের ভেতরটা ধ্বক করে উঠল। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব শিথিল হয়ে দলা পাকিয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত শুরু হলো দীর্ঘস্থায়ী আক্ষেপ। আর তারপরেই বোজা চোখে ভেসে উঠতে লাগল একটার পর একটা ছবি।

ছবিগুলো স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ কিন্তু ছবির চারিদিকটা দুধ-সবুজ আলোয় অস্পষ্ট।

একটা চিলেকোঠা। মাঝখানে একটা বিছানা। তার উপর শুয়ে আছে একটা মানুষ, লালচে টুইডের টপ কোট গায়ে। মানুষটি চওড়া, মোটাসোটা, পাতলা কালো চুল, নাকের উপর এবড়ো-খেবড়ো সাদা ক্ষত চিহ্ন।

চিলেকোঠার দরজাটা খুলে গেল। ফ্রাউ লিৎনার ভেতরে ঢুকল। মাথার টুপিটা খুলে ফেলল। কালো চুল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

মুহূর্তের জন্য সব অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর আর একটা ছবি-

বনের গভীরে একটা পথ দেখতে পেলাম। পাইনের ডালপালা পড়ে রয়েছে। পথের শেষে একটা খোলা জায়গা। নানা গাছের ফাঁক দিয়ে দুধ-সবুজ রোদ এসে পড়েছে সেখানে। মাঝখানে বিছানো রয়েছে লালচে টুইডের একটা টপকোট। তার উপর শুয়ে আছে সেই মোটাসোটা লোকটি আর ফ্রাউ লিৎনার। তারা পরস্পরকে আদর করছে, চুমো খাচ্ছে।

অন্ধকার। আর একটা ছবি। ফুল আঁকা ওয়াল পেপারে আবৃত একটা ঘর। বসন্তকালের সাজানো ফুলদানি, বাতাসে পর্দা উড়ছে, ড্রেসিংটেবিলে কাঠের সব পুতুল সাজানো। দরজা খুলে গেল। লালচে টুইডের টপকোট পরা মোটাসোটা লোকটি ঘরে ঢুকল। কোটটা খুলে ফেলল। শুধু শুনতে পেলাম ফুঁপিয়ে কান্না, ধীর আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস এবং একটি দীর্ঘ মর্মভেদী চিৎকার। আবার গাঢ় অন্ধকার।

এবারকার ছবিটা ঝলমল করছে। দেখলাম ঝোলানো কার্ণিশঅলা উঁচু বাড়ির একটা শোবার ঘর। কানে এলো করাত চালাবার খসখস ঘসঘস শব্দ। বিছানায় নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে মোটাসোটা চওড়া লোকটি আর ফ্রাউ লিৎনার। সে পুরুষটিকে পা দিয়ে চেপে ধরেছে। তার চওড়া পিঠটা পুরুষটির বিকৃত, ঘর্মাক্ত মুখের দিকে ফেরানো।

দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকল ফ্রিৎজ ও মোটা ফ্রলিন শ্নি।

ফ্রাউ লিৎনার তাদের দেখেই চিৎকার করে উঠল। চিৎকার চেঁচামেচিতে একটা হুলস্থূল পড়ে গেল। হঠাৎ তার হাতটা সজোরে আমার গালে আঘাত করল। চোখ মেলে তাকালাম।

ঘরটা আবার অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু সেই আলোর রশ্মিটা পড়েছে ডিভানের উপর। আমি সেখানেই শুয়ে আছি। ফ্রাউ লিৎনারের জিভটা আমার কান খুঁজছে। তার হাত দুটো চেপে বসেছে আমার উরুতে।

সে এবার বলল, 'হের মর্গান, এবার চোখ মেলার সময় হয়েছে।' আমার গলার

নিচে হাত রেখে সে আমার মাথাটাকে তুলে ধরল। আর আমার সামনে ধরল একটা ছোট আয়না। বলল, 'তাকান।'

আয়নার দিকে তাকালাম। যা দেখলাম সেটা তো আমার মুখ নয়। যে মুখটা দেখলাম সেটা যার, তার চেহারা চওড়া ও মোটাসোটা, মাথায় পাতলা কালো চুল, নাকের উপর সাদা কাটা দাগ।

আর তার এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত, গলা থেকে একটা রক্তের ধারা নেমে বুকের ওপর গড়িয়ে পড়ছে। চিৎকার করে উঠলাম। তীক্ষ্ণ, দীর্ঘায়ত চিৎকার। আমার বুকের গভীর থেকে সে শব্দটা প্রবল বেগে বেরিয়ে এলো।

পুলিশ ভোর হতেই আমার ঘরে এলো। আমাকে তারা বাইরে বার করে গাড়িতে তুলল। জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল। তারপর একটা নালার ধারে। নালার ওপর একটা প্লাস্টিকের চাদর। তারা চাদরটা সরিয়ে দিল। নালার মধ্যে দু'টো লাশ।

তারপর?

তারপর আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ, এরা আমার ছাত্র ফ্রিৎজ ও ফ্রলিন শ্নি। আমার হাড়ে কাঁপুনি শুরু হলো। ভালো করে দাঁড়াতেও পারছি না। ফ্রিৎজের মৃতদেহ থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম না। লালচে টুইডের টপ কোট দিয়ে সেটা জড়ানো।

চারদিন পরে স্কুল ছেড়ে চলে এলাম। ফ্রাউ লিৎনার আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দিল। ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালে সে আমার হাতটা সজোরে চাপ দিল।

বলল, 'বিদায়, হের ব্র্যান্ডন।' তারপর আমার কোমর জড়িয়ে ঠোঁটে দীর্ঘ, আবেগের সঙ্গে তীব্র চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিল। ভগ্ন স্বরে বলল, 'আমার দুঃখ যে আপনি এখানে থাকলেন না। দু'জনে মিলে আমরা অনেক কিছু এখানে করতে পারতাম।'

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তার হাতটা ধরলাম। তার দুটি পা ঘিরে ট্রেনের বাষ্প ছড়িয়ে পড়ল। বাঁশি বাজল।

সে উপুড় হয়ে তার ক্যানভাসের থলে থেকে কি যেন বার করল। বলল, 'আপনার জন্য।' ট্রেন ছেড়ে দিল। সে একটি চুমো আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

ট্রেনটা ছেড়ে বাঁক না নেওয়া পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিছুক্ষণ সে নড়ল না। তারপর দ্রুত হাতে টুপিটা খুলে ফেলল। শীতের হাওয়ায় তার উজ্জ্বল, রেশমী, কালো চুল এলোমেলো হতে লাগল।

ট্রেনের গতি ক্রমে বাড়ল। বনটা দ্রুত পিছিয়ে গেল। ফ্রাউ লিৎনার তার থলে খুলে যে মোটা পার্সেলটা আমাকে দিয়েছিল, এবার সেটার দিকে তাকালাম।

তারপর যথাসাধ্য জোরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম।

- শেষ -